(পৌরাণিক চিত্র)

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মূল্য বিলাতী বাঁধাই এক টাকা মাত্র

উপহার

সূচীপত্র

প্রাণের কথা।

ধর্ম্মই হিন্দুর জীবন, ধর্ম্মই হিন্দুর সম্বল। পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি চিরকালই ধর্ম্মবলে বলীয়ান্। ধর্ম্মই বিমল আনন্দের উৎস। এই ধর্ম্মভাব হিন্দুরমণীর চির-মজ্জাগত। হিন্দু-ললনার ধর্ম্ম-প্রাণতাই, আজিও ভারত-বর্ষকে সভ্য জগতের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উন্নীত রাখিয়াছে। কিন্তু বড়ই অনুতাপের বিষয় এই স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব হিন্দুরমণীর মন হইতে দিন দিন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু সে দোষে দুষ্ট নহেন—কোন মতেই সেজন্য দায়ী নহেন। সে দোষ সর্ব্বথা আমাদের—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আর ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব।

আমরাই যখন স্ত্রীজাতির সকল কার্য্যের নিয়ন্তা, তখন এই সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দেশে নারী জাতির এতাদৃক্ নৈতিক অবনতি কেন? কারণের সন্ধানে সকলেই নিশ্চেষ্ট। নীতিশিক্ষার অভাবই যে এই অবনতির প্রধান হেতু, তাহা মনিষিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। শিক্ষার প্রাক্কাল হইতে আমাদের কয়জন গভীর জ্ঞান ও নীতিগর্ভ রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থ আগ্রহ সহকারে বালক বালিকাগণকে পাঠ করিতে দিই? আমাদের ধারণা ওসব জানা জিনিষ, আর

ওসব পাঠ করিবার অন্য সময় আছে—তাহার অর্থ বোধ হয় বৃদ্ধ বয়সই ধর্ম্মচর্চ্চার প্রশস্ত কাল! এই ধারণা যে কত ভ্রমাত্মক এবং তাহার পরিণাম যে কিরূপ মারাত্মক কুফল-দায়ক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই।

হিন্দুজাতির দাম্পত্য-বন্ধন যে কিরূপ সুখশান্তিময়, কিরূপ স্বর্গীয়, তাহা অনেকেই জানেন। নীতি-শিক্ষার প্রভাব-সম্ভূত ধর্ম্মজীবনই এই সুখের মূলীভূত কারণ। যে স্ত্রীজাতি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, যে স্ত্রীজাতি মাতৃরূপে সতত বিরাজ করেন, যে স্ত্রীজাতি স্নেহ-মমতার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিনী, সকল সুখের নিদান ও সমসুখদুঃখভাগিনী, সেই স্ত্রীজাতির ধর্ম্মভাব যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি সকলেরই সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। আনুপূর্ব্বিক এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আশার আলোকে অনুপ্রাণিত হইয়া পৌরাণিক যুগের কয়েকটী নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা একত্র সন্নিবেশিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা দ্বারা আমাদের ভবিষ্য-সুখের আশ্রয়স্থল বালিকাগণের নীতিশিক্ষার কথঞ্চিৎ সহায়তা হইলে ধন্য হইব।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

যে **দেবী-প্রতিমার** ধর্ম্মপরায়ণতা, দেবদ্বিজে দৃঢ়বিশ্বাস,
গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তি, দীন দরিদ্রে দয়া-দাক্ষিণ্য, কর্ম্ম-
কুশলতা, অনন্যসাধারণ সরলতা ও কমনীয়তা, তেজস্বিতা
ও সুপ্রসন্নতা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া, শোকসন্তপ্ত
হৃদয়কে আত্ম-প্রসাদের হিল্লোলে উচ্ছলিত করিয়া তুলে,
যিনি সুখশান্তিহীন চিরকোলাহলময় সংসার হইতে
বহু দূরে, অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত, এই ক্ষীণ লেখনী-
প্রসূত মহতী আখ্যায়িকা **পুণ্য-কাহিনী**
তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহারই উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত হইল। দেবি! অনেক আশা,
অনেক আকাঙ্ক্ষা লইয়া, হৃদয়ে
তোমার পুণ্য-স্মৃতিটুকুমাত্র পোষণ
করিয়া তোমারই তর্পণের
প্রয়াসী হইয়াছি। তুমি
পরিতৃপ্ত হইলে,
আমার সকল
আশা পূর্ণ
হইবে।

পুণ্য-কাহিনী

সীতা

অনেক দিনের কথা। অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে একজন বড় রাজা ছিলেন। তিনি যেমন পরম ধার্ম্মিক, তেমনি প্রজা-পালক। মহারাজ দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন রাণী। কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—রাজার এই চারি পুত্র ছিল। চারিটী পুত্র দেখ্‌তে যেমন সুশ্রী, গুণেও তেমনি সকলের প্রিয়। রাম চারি ভাইএর মধ্যে বড়। দেবতার মত তাঁ'র চেহারা—প্রকৃতিও দেবতার মত। প্রজাগণ তাঁর' গুণে মুগ্ধ—সকলের মুখেই তাঁর গুণের কথা। বাল্যকাল হ'তেই লক্ষ্মণ তাঁ'র বড় অনুরক্ত,

দু'টী ভাই যেন এক মন, এক প্রাণ—এক দণ্ডের জন্য কেহ কা'কেও না দেখে থাক্‌তে পারতেন না।

চারিটী ভাই শুক্লপক্ষের চাঁদের ন্যায় দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। এমন সোণার চাঁদ ছেলে পাইয়া রাজার ও রাণীদের মনে আর আনন্দ ধরে না। এইরূপে কয়েক বৎসর যায়—হঠাৎ একদিন বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়া রামলক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র একজন খুব বড় তপস্বী। রাক্ষসেরা আসিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উৎপাত উপদ্রব করিত। তাহাদের অত্যাচারে যজ্ঞের নানারূপ ব্যাঘাত হইত। রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য তাঁহার রাম ও লক্ষ্মণকে দরকার—রাজা দশরথ সম্মত হইলেন। দুই ভাই ধনুর্ব্বাণ লইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে চলিলেন.

এই সময়ে মিথিলা নগরীতে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম জনক রাজা। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে রাজর্ষি জনক বলে। রাজর্ষি জনকের পরমা রূপবতী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম সীতা। তাঁহার রূপও যেমন, গুণও

সেইরূপ। জনক রাজা গুণবতী সীতাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার একটী অতি প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। উহা তিনি শিবের নিকট পাইয়াছিলেন। এজন্য উহাকে হরধনু বলা হয়। ধনুকটী এরূপ বৃহৎ ও এত ভারী ছিল যে, যে সে উহা তুলিতে পারিত না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি এই ধনুকে গুণ দিতে পারিবেন, তাঁহার হস্তেই অনিন্দ্যসুন্দরী সীতাকে অর্পণ করিবেন। সীতা বিবাহ-যোগ্যা হইলে, রাজর্ষি জনক মহা আড়ম্বরের সহিত কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশে রাজা ও রাজ-কুমারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই সংবাদ পাইয়া, রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলেন। সীতাদেবী বিচিত্র বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া কারুকার্য্যময় সুবর্ণ পাত্রে বিচিত্র পুষ্পমাল্য লইয়া সলজ্জ আননে সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজারা একে একে উঠিয়া ধনুকের কাছে যাইতে লাগিলেন। ধনুকে গুণ দেওয়া দূরের কথা,

অনেকেই উহা তুলিতেও পারিলেন না! কেহ যদি বা অতি কষ্টে তুলেন, কিছুতেই ধনুকে গুণ যোজনা করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বা গুণ টানিতে গিয়া উল্টাইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজাগণ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া যে যার জায়গায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সকল রাজাই যখন বিফল-মনোরথ, তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে ধনুকে গুণ-যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। বালক রাম মুনির আদেশে ধনুকের নিকট যাইয়া, অনায়াসে উহা তুলিয়া লইলেন এবং এরূপ জোরে গুণ-যোজনা করিলেন যে, মড় মড় শব্দে ধনুকটী ভাঙ্গিয়া দু'খান হইয়া গেল! বালকের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত! জনক রাজা ও সভাস্থ সকলেই রামকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সীতাদেবী মনে মনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং পদ্মপলাশ-লোচন রামের গলায় মাল্য প্রদান করিলেন। সভা মধ্যে ঘন ঘন জয়-ধ্বনি হইতে লাগিল। মনোমত পাত্রে কন্যাকে অর্পণ করিয়া রাজর্ষি জনকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এই সংবাদ রাজা দশরথের নিকট

প্রেরণ করা হইল, তিনি মহানন্দে স্বজনগণের সহিত জনক রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ দশরথ মহা আড়ম্বরে ছেলে ও বৌ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। পুত্র রাম যেমন সকল গুণের আধার, বৌটীও হ'য়েছে ঠিক সেইরূপ—রূপ ও গুণ তাঁহাতে একাধারে বর্ত্তমান। ঠিক যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। অযোধ্যা নগরীতে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজা দশরথ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শুভদিন দেখিয়া রামের অভিষেকের আয়োজন করিতে বলিলেন। বশিষ্ঠদেব গণনা করিয়া বলিলেন, "কল্যই অভিষেকের প্রশস্ত দিন। এমন শুভদিন প্রায় হয় না। অতএব মহারাজ! কল্যই রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন।" মহারাজ দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। "কল্য প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক"—মন্ত্রী, সভাসদ্, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী সকলকেই

অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। রাজার আদেশে সকলেই কাজে মাতিয়া গেল। তড়িত প্রবাহের ন্যায় এই শুভ সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, প্রজাগণ যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক ঘট, পুষ্পমাল্য ও নানাবর্ণের পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ নানাবিধ সুন্দর ও সুদৃশ্য সজ্জায় সুশোভিত হইল! নগরের চারিদিকেই আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। মহানগরী অযোধ্যা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

রাজমহিষীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সকলের মুখেই অভিনব আনন্দের চিহ্ন। এ হেন আনন্দের দিনে হর্ষ নাই কেবল একজনের। সে কৈকেয়ীর দাসী—কুঁজীর। কুঁজী কৈকেয়ীর বড় প্রিয়, তাহার আর এক নাম মন্থরা। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইবেন শুনিয়া, তাহার প্রাণ হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল, মুখ ভার করিয়া কৈকেয়ীর নিকটে গিয়া বলিল, "রাণি, রাম রাজা হবে শুনে তোমার ত দেখ্ছি ভারি আনন্দ,

আমার কিন্তু ইহা সহ্য হ'চ্ছে না। রাম তোমার সতীন-পুত্র। সতীন-পুত্র রাজা হ'লে, পরে তোমার, ভরতের ও আমার কি দুর্গতি হবে, ভেবে দেখেছো কি? যদি ভাল চাও, শীঘ্রই এর একটা প্রতীকার কর, নইলে তোমার দুঃখের অন্ত থাক্‌বে না। আমি উপায় ব'লে দিচ্ছি। দেবাসুরের যুদ্ধে মহারাজ আহত হ'লে, তুমি তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করেছিলে। তা'তে তিনি প্রাণ-লাভ করেন এবং তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দু'টী বর দিবেন ব'লেছিলেন, তুমি কি তা' ভুলে গেছ? এখনই মহারাজ আস্‌লে তাঁর কাছে সেই বর দু'টী প্রার্থনা কর। এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও অন্য বরে রামের বনবাস—এই দু'টী বর এখনই চেয়ে নাও।" মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর পূর্ব্ব ভাব তখনই দূর হইয়া গেল, তাঁহার সর্ব্ব শরীর হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তখনই নিজগৃহে যাইয়া নিজের কাপড় ও গহনা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া রোষাগারে যাইয়া রাগভরে ধূলায় পড়িয়া রহিলেন।

মহারাজ দশরথ রাজকার্য্য সমাপন করিয়া মহিষীদের নিকট শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, হঠাৎ কৈকেয়ীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুষ্টমতি কৈকেয়ী কালসাপিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বিষ উদ্গীরণ করিল। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ীকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু নীচাশয়া কৈকেয়ী কিছুতেই শুনিলেন না। রামগত-প্রাণ মহারাজ দশরথ চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, তিনি যেন শোকে, দুঃখে, ঘৃণায় পাগলের মত হইয়া গেলেন! পরদিন প্রভাতে কৈকেয়ী রামকে তাঁহার বনগমনের কথা বলিলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম তখনই বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ কোথায় তিনি রাজা হইবেন, আর কোথায় তাঁহার বনবাস—এই কথা শুনিয়া রাজপুরী গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়া গেল। রাম পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া সেই দিনই বনে যাইবার জন্য বাহির হইলেন।

পতিপ্রাণা সীতা স্বামীকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। স্বামীর সঙ্গে থাকাই তাঁহার রাজ্যসুখ। লক্ষ্মণও তাঁহাকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিবেন না। দু'জনেই রামচন্দ্রের সঙ্গে চলিলেন। রাজার ছেলে ও বৌ আজ ভিখারীর বেশে বনে যাইতেছেন। তাঁহারা দণ্ডক বনে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস ও বনের ফল মূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। নিকৃষ্ট ঘরে বাস ও বনের ফলমূল খাইয়াও রাজার নন্দিনী সীতা পরমানন্দে শ্রীরামের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলেন।

লঙ্কায় রাবণ নামে একজন রাক্ষস রাজা ছিল। সে সীতার সৌন্দর্য্যের কথা শুনে, একদিন তাঁকে একলা ঘরে পেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে গেল। সীতা স্বামীর শোকে অধীর হ'য়ে প'ড়লেন। চখের জলে তাঁর গণ্ডস্থল ভেসে যেতে লাগ্‌লো। তাঁর কান্না দেখে বনের পশুপাখীরাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। রাম ও লক্ষ্মণ ফিরে এসে দেখ্‌লেন যে, ঘরে সীতা নাই। সীতাকে না দেখে তাঁদের প্রাণ উড়ে গেল, কত যে

দুঃখ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। অবশেষে দুই ভাইয়ে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে সীতার খোঁজে বাহির হ'লেন। অনেক দিনের পরে সীতার সন্ধান হ'ল। বনের বানরদের সাহায্যে সাগর বেঁধে রাবণ রাজার রাজধানী লঙ্কায় পৌঁছিলেন; রাম-লক্ষ্মণের সহিত রাবণ রাজার তুমুল যুদ্ধ বাধ্‌লো। দুষ্ট দশানন সবংশে নিহত হ'লো—এমন কি বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইল না।

সীতা অনেক দিন রাক্ষসগণের নিকট লঙ্কায় ছিলেন ব'লে, যদি কেউ তাঁর চরিত্রে সন্দিহান হয়, তাই আজ তাঁর অগ্নি-পরীক্ষা। ধূ ধূ ক'রে আগুণ জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। সীতা সেই আগুণে প্রবেশ ক'রবেন। আগুণে প্রবেশ কর্‌বার আগে রামচন্দ্রের পদধূলি নিলেন, দেবতাদের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা ক'রলেন, "হে দেব দেবিগণ! তোমরা সাক্ষী, আজ সতীর পরীক্ষার দিন, তোমরা চিরদিন সতীর মুখ রেখেছো। তোমরাই আমাকে দুষ্ট দশাননের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছো। দেখো ঠাকুর! দোহাই তোমাদের, সতীর তেজ, সতীত্বের মহিমা

পুণ্য-কাহিনী ১০ পৃষ্ঠা—

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

অভয়া প্রেস, কলিকাতা

যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি যদি যথার্থ সতী হই, তা হ'লে অগ্নি আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে পার্বে না।" এই ব'লে তিনি সাতবার অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ক'রে, সেই ভীষণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ ক'র্লেন। সতীর অঙ্গ স্পর্শ করে, এমন তেজ অগ্নির নাই। সতীর তেজের নিকট আগুণ যেন জল হ'য়ে গেল! কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাদেবীকে কোলে নিয়ে দণ্ডায়মান দেখে', সকলেই সীতাকে ধন্য ধন্য ক'রতে লাগ্লেন। তখন রাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সীতাকে গ্রহণ ক'রলেন।

চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকিয়া, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিলেন এবং রাম অযোধ্যার রাজা হইলেন। রাম ও সীতাকে পাইয়া সকলেই যেন প্রাণ পাইল। প্রজাগণের আনন্দের সীমা নাই। এইরূপে পরম সুখে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। কৌশল্যা তাঁহার অঞ্চলের নিধি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মীস্বরূপিনী পুত্রবধূ সীতাদেবীকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

কিছুদিন পরে সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। অন্তঃপুরে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। রাজমাতা কৌশল্যার আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু সীতার ভাগ্যে

বিধি সুখ লেখেন নাই। চিরদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের কেহ কেহ পতিপরায়ণা সতীসাধ্বী সীতাদেবীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া গোপনে নানা কথা বলিতে লাগিল। প্রজারঞ্জক রাম প্রজাগণের মনোভাব জানিতে পারিয়া, তদ্দণ্ডেই গর্ভবতী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! প্রজাগণ সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ দোষারোপ করিতেছে। আমি প্রজারঞ্জনের জন্য অঙ্কলক্ষ্মী সীতাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি কল্য প্রভাতে তাঁহাকে তপোবন-দর্শনে যাইবার কথা বলিয়া বনবাসে রাখিয়া আসিবে।" চির অনুগত লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশে দ্বিরুক্তি না করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে রাজনন্দিনী জানকীর নিকট তিনি তপোবন-দর্শনে যাইবার অভিমত জানাইলেন। তপোবন-দর্শন সীতার বহুদিনের বাঞ্ছিত। আজ তিনি সেই চিরবাঞ্ছিত তপোবন-দর্শনে যাইবেন শুনিয়া, তাঁহার মুখনলিনী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পুণ্য-কাহিনী ১৩ পৃষ্ঠা-

সীতার বনবাস

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিলেন। রথ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামচন্দ্রের আদেশ যথাযথ জানকীর গোচর করিলেন। জানকী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া, অচেতন হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণের পর চেতনা পাইয়া, কেবলমাত্র নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। স্বামীর এহেন গর্হিত কার্য্যের জন্য তাঁহার উপর একটীও দোষারোপ করিলেন না। কেবল নিজ দুরদৃষ্টের কথাই উল্লেখ করিতে লাগিলেন।

"বিনা অপরাধে পতি দিলা বিসর্জ্জন,
তবু তাঁরে না দোষিলা জনক-নন্দিনী।
কেবল নিন্দিলা সতী অদৃষ্ট আপন—
'নিজ কর্ম্মদোষে আমি চির অভাগিনী'।

'পরম সুবুদ্ধি তিনি ; কহিব কেমনে
স্বেচ্ছাচার বশে মোরে করিলা বর্জ্জন।
পূর্ব্ব জনমের পাপে হায়! এ জীবনে
কপালে হ'য়েছে মোর অশনি-পতন'।

'অঙ্কগতা রাজলক্ষ্মী ত্যজি রঘুবর
আমারে লইয়া সাথে গিয়াছিলা বনে !
তাই রোষে রাজলক্ষ্মী পেয়ে অবসর
রহিতে না দিলা মোরে পতির ভবনে'।

'তপস্যা করিব আমি প্রসবের পরে
সূর্য্যপানে রাখি দৃষ্টি, ক'রেছি নিশ্চয় ;
পাই যেন এই পতি জন্মজন্মান্তরে
কিন্তু হেন দুঃখ যেন সহিতে না হয়'।"

লক্ষ্মণ মাতৃস্বরূপিনী সীতাদেবীকে কি বলিবেন, কি বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবেন, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবিরল চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে অযোধ্যায় ফিরিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলে, সীতাদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। নিকটেই বাল্মিকী মুনির আশ্রম। মুনিবর অদূরে রমণীর ক্রন্দন শুনিয়া, দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীর মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। মুনি যোগবলে সকলই বুঝিলেন এবং নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে

নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। আশ্রমবাসিনী মুনিপত্নীগণের সহিত তিনি একত্র বাস করিতে লাগিলেন। মুনিবর বাল্মিকী আপন কন্যার ন্যায় অতি যত্নে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপা সতীসাধ্বী জনকনন্দিনীর যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এইরূপে মুনির আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সীতাদেবী দুইটী পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রমুখ দেখিয়া তাঁহার শোক অনেকটা কমিল। বাল্মিকী কুমার দুইটীর যথাবিধি সংস্কার করিলেন এবং তাহাদের নাম রাখিলেন লব ও কুশ। কুমারদ্বয় দিন দিন বড় হইতে লাগিল। শৈশব হইতেই মুনি তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন এবং বীণা যন্ত্রের সাহায্যে রামায়ণ গান শিখাইলেন।

রামচন্দ্র কিছুদিন পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহর্ষি বাল্মিকী এই সংবাদ অবগত হইয়া লব ও কুশকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া কুমার-যুগলকে বীণা বাজাইয়া

রামায়ণ গান গাহিতে বলিলেন। নানা দেশের রাজারা এই অশ্বমেধ যজ্ঞে আসিয়াছিলেন। রাজাগণ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং পুরনারীগণ সভাস্থলে আসীন। ঋষিকুমার-সদৃশ রাজকুমার দ্বয় সমস্বরে মধুর রামায়ণ গান করিতে লাগিল। গান শুনিয়া সভার সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রাজা রামচন্দ্র ও রাজমাতা কৌশল্যা এই গান শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। বালকগণের মুখে সীতার নাম শ্রবণাবধি তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। রামচন্দ্র অল্পকাল পরেই সভাভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন এবং বাল্মিকীর নিকট অগ্রসর হইয়া, বালকগণ কে এবং তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুনিবর বলিলেন, "সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাম! তুমি কি সেই আদর্শ-চরিতা সতী-শিরোমণি সীতার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? রমণীরত্ন সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনে পাঠাইয়া দিয়াছিলে, তাহা কি তোমার মনে হয় না? পতিপ্রাণা জনক-নন্দিনীর উপর এরূপ ব্যবহার তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ লোকের আদৌ শোভা পায় না। এই

কুমার দুইটী সীতার গর্ভজাত তোমারই সন্তান।" রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি সকলেই শিশুদ্বয়ের আপাদ-মস্তক অবলোকন করিলেন—দেখিলেন, কুমারদ্বয় যেন রামেরই প্রতিকৃতি, উভয়েই যেন শিশু-রামচন্দ্র। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই "হা সীতা!" "হা সীতা!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মুনিবর বাল্মিকী বলিলেন, "রাম! জানকী যে বিশুদ্ধ-চরিতা তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ কর।" এই বলিয়া তিনি সীতাদেবীকে সম্মুখে আনিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী, জনকরাজ-দুহিতা, রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ-রত্ন সীতা অপরাধিনীর ন্যায় সভার এক কোণে ম্রিয়মাণা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামচন্দ্র তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন, এই আশায় সীতার হৃদয় যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তিনি একেবারে সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু জানকী চিরদুঃখিনী। বিধাতা তাঁহার কপালে সুখ লেখেন নাই। চিরদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই তিনি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মিকীর আদেশে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু

সর্ব্বজন সমক্ষে আর একবার তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার কথা বলিলেন। সতীরত্ন সীতা এই প্রস্তাবে অতিমাত্র লজ্জিতা হইলেন ও প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি রাজ্যসুখভোগের আশায় এই লজ্জাকর প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, করযোড়ে রামচন্দ্রকে বলিলেন "দেব! আর আমায় লজ্জা দিবেন না। সতী নারী কখনও সতীত্বের অহঙ্কার করে না। আমি চিরদুঃখিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। চিরদুঃখেই আমার জীবনের অবসান হউক। আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণাধার স্বামী পাইয়াও আমার এত দুঃখ—আমি আপনার পরিত্যক্তা, রাজমহিষী হইয়াও বনবাসিনী। আজ আপনার ঔরসজাত আমার প্রাণের প্রাণ লবকুশকে আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। রাজ্যসুখ-ভোগ অপেক্ষা আপনার চরণ সেবাই আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ভগবান্ আমাকে সে সুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন। সকলই আমার দুরদৃষ্ট। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রজাগণের মনস্তুষ্টির জন্য আপনি আমাকে বনবাসে দিয়াছেন। আর্য্যপুত্র! ইহাতে আমি আপনার দোষ দেখি নাই—আমার কর্ম্মফল আমি

ভোগ করি। আমি আর রাজ্যসুখ চাহি না। আমার সময়ও শেষ হইয়াছে। আমি চলিলাম, আপনার ঐ রাজীবচরণে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনাকে স্বামীরূপে পাই।" এই বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা ধরিত্রি! চিরদুঃখ ভোগ করাইবার জন্য আমায় কোলে স্থান দিয়াছিলে। আবার কোলে লও মা, আমার সকল দুঃখের অবসান হউক।" নিমেষমধ্যে পৃথিবী দ্বিধা হইয়া গেল! চিরদুঃখিনী সীতাদেবী তন্মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অমনি পৃথ্বীদেবী কন্যাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন! অযোধ্যানগরী পুনরায় শোকে নিমগ্ন হইল।

রমণীকুলের রত্নভূতা সীতাদেবী ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যাবচ্চন্দ্র দিবাকর জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্তিমান্ থাকিবে।

শৈব্যা

রাকালে অযোধ্যা নগরে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন অতি ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। শৈব্যা মহারাজ হরিশচন্দ্রের মহিষী। তিনি অতি রূপ-লাবণ্যবতী রমণী ছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজকার্য্যের প্রতি মহারাজের আস্থা যেন দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। রাজকার্য্যে তাঁহার ঈদৃশ অমনোযোগিতা দেখিয়া শৈব্যা ভীতা ও চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। প্রকারান্তরে তাঁহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহিত করিবার জন্য অভিমানের ভান করিয়া দূরে দূরে থাকিতেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যেমন প্রজাবৎসল, রাজমহিষী শৈব্যাও তেমনি প্রজাগণের দুঃখে কাতর হইয়া

পড়িতেন। রাজার মহিষী বলিয়া কোন দিন গর্ব্ব, বিলাসিতা বা কঠোরতা তাঁহার মনে স্থান পায় না। এক সময়ে রাজ্য মধ্যে এক বন্য বরাহ প্রবেশ করিয়া, প্রজাগণের নানা প্রকার অনিষ্ট করিতে লাগিল। দয়াবতী শৈব্যা এই কথা শুনিবামাত্র প্রাণে অতিশয় ব্যথা পাইলেন এবং মহারাজকে বলিলেন, "দেব! আপনার রাজ্য-মধ্যে একটা বন্য বরাহ প্রবেশ করিয়া, প্রজাগণের এরূপ অনিষ্ট করিতেছে, শুনিয়াও আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজাপালন। আপনি অবিলম্বে বরাহ নিধন করিয়া প্রজাগণকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করুন। যতদিন পর্য্যন্ত বরাহ নিহত না হয়, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, প্রাণে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রজাগণের দুঃখের কথা শুনিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করুন।" রাজমহিষীর এইরূপ প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া, মহারাজ আন্তরিক প্রীতিলাভ করিলেন এবং পর দিন প্রভাতে বরাহ-শিকারে বহির্গত হইবেন, স্থির করিলেন।

তৎকালে বিশ্বামিত্র নামে একজন মহাপ্রভাবশালী

তপস্বী ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। অযোধ্যার এক বনে ইঁহার আশ্রম ছিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বরাহের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকট আসিবামাত্র রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। শাপভ্রষ্ট কতিপয় দেববালা আশ্রমের নিকট বাস করিতেন এবং আশ্রমের চারিদিকে ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। আশ্রমের বৃক্ষলতাদি ছিন্নভিন্ন হওয়ায় বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন। সেই শাপে দেববালাগণ লতা মধ্যে এরূপভাবে বিজড়িত ও নিষ্পেসিত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই মর্ম্মভেদী কাতরকণ্ঠ শুনিয়া দ্রুতপদে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেববালাগণকে লতাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। পুণ্যব্রত মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কর-স্পর্শে দেববালাগণ শাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, গাছ-পালা পূর্ব্ববৎ ছিন্নভিন্ন ও শুষ্ক, অথচ সেখানে কেহই নাই। যোগ-বলে জানিতে পারিলেন যে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আশ্রমের অনিষ্টকারিণী দেববালাগণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তখন তাঁহার রাগ আর দেখে কে? ক্রোধে তাঁহার চক্ষু জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। "রাজা হইয়া তাঁহার আশ্রমে অনধিকার-প্রবেশ, এত বড় স্পর্দ্ধা? এখনই ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক," এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে অযোধ্যার দিকে চলিলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইবামাত্র, তপোবন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার জন্য তিনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে নানারূপ কর্কশ কথা বলিলেন। রাজা নিজদোষ স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "মুনিবর! দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান, আর্ত্তের ত্রাণ, প্রজাগণের সন্তোষ-বিধান প্রভৃতি রাজার প্রধান ধর্ম্ম। আমি আর্ত্তের ত্রাণ করিয়াছি। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য মার্জ্জনীয়।" রাজার মুখে দানধর্ম্মের কথা শুনিয়া, তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য মহর্ষি বলিলেন, "যদি দানধর্ম্মাদিই রাজার

প্রধান কর্ত্তব্য তবে আমি আপনার নিকট এই ধনজনপূর্ণ রাজ্য প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে প্রদান করুন।”

সত্যব্রত হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শুনিয়া কিছু-মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, “তপোধন! আমি এখনই এই ধনজনপূর্ণ রাজ্য আপনাকে দান করিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আজ আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলাম।” এই বলিয়া মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া উহা মহর্ষির হস্তে অর্পণ করিলেন। মহারাজের এই কার্য্য দেখিয়া সভাস্থ সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। মুনিবর ধর্ম্মের পরীক্ষার জন্য মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ! দান ত করিলেন। দানের কিছু দক্ষিণা ত চাই!” মহারাজ মুনির প্রার্থনা মত এক হাজার সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ রাজভাণ্ডার হইতে হাজার মুদ্রা আনিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র বাহ্যিক কোপ দেখাইয়া বলিলেন, “মহারাজ! রাজকোষে ত আপনার আর অধিকার নাই। আপনি ইতিপূর্ব্বেই যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন।” বিশ্বামিত্রের এই কথা

শুনিয়া মহারাজের জ্ঞান হইল, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "উপস্থিত আমার ত কিছুই নাই, আমাকে এক মাস সময় দিন। আমি এক মাসের মধ্যেই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।" বিশ্বামিত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, "আজ হইতে এই রাজবাটী এবং রাজ্য আমার। ইহার মধ্যে আপনার আর স্থান নাই। কল্য প্রত্যূষেই আপনাকে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।" মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এতক্ষণে আপনার অবস্থার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিলেন এবং রাজমহিষী এই কথা শুনিয়া কতই না দুঃখিত হইবেন, কতই না তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই এই নিদারুণ সংবাদ রাজমহিষীর কর্ণ-গোচর হইয়াছিল। এরূপ দুঃসংবাদে সকলেরই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। প্রাণে আঘাত লাগা বা বিমর্ষ হওয়া ত দূরের কথা, তিনি এই কথা শুনিয়া মনে মনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ ম্লান মুখে ধীরে

ধীরে মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে কি বলিবেন, যেন কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না! এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া রাজমহিষী কতই না দুঃখ পাইবেন, কতই না রাগ করিবেন, এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শৈব্যা মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ! আপনার আজ এরূপ বিমর্ষ ভাব দেখিতেছি কেন? মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে আজ অধিকতর প্রফুল্ল দেখিব। কি জন্য আজ এমন উন্মনা হইয়াছেন? আমি ত সকল কথা শুনিয়াছি। শুনিয়া অবধি যার পর নাই আনন্দ বোধ করিতেছি। বিমর্ষ হইবার কাজ ত আপনি কিছুই করেন না। এ কাজ ত আপনার ন্যায় নরপতিরই যোগ্য। দানধর্ম্ম ও প্রজার সন্তোষ বিধানই ত রাজার প্রধান কার্য্য। আমি ত ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণই দেখি না। আপনি হয় ত মনে করিয়াছেন, আমি ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইব, আপনার উপর রাগ করিব, কতই না তিরস্কার করিব। কিন্তু, মহারাজ! যে মুহূর্ত্তে এই শুভ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তদবধি আমার প্রাণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ বিমল আনন্দ

আমি জীবনে আর কোন দিন পাই নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার এই কার্য্যের সমর্থন করিতেছি। এইরূপ দান, এইরূপ ত্যাগ-স্বীকার আপনাতেই সম্ভবে। ইহা আপনার ন্যায় মহানুভব নরপতিরই উপযুক্ত। অধিক কি, আপনি যদি মহর্ষির প্রার্থনায় সম্মতি দান না করিতেন, তাহা হইলে, আমি প্রাণে আদৌ শান্তি পাইতাম না। আর আমি দুঃখিতই বা কেন হইব ? বলুন দেখি, আমার ন্যায় ভাগ্যবতী নারী পৃথিবীতে কয়জন আছে, কয় জনের ভাগ্যেই বা আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ হয় ? এমন দেবতুল্য স্বামী যাহার, তাহার আবার কিসের অভাব, কিসের দুঃখ ? মহারাজ! স্বামীর চরণপ্রান্তই সতী নারীর চিরশান্তির নিদান, পতির চরণ-সেবাই ত নারী-জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও একমাত্র উপাস্য। আপনার পদপ্রান্তে থাকিতে পাইলে, আমি স্বর্গসুখও চাহি না। আপনিই আমার স্বর্গ, আপনিই আমার মোক্ষ, আপনিই আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। আর এক কথা, সুখ দুঃখ ত মানুষ মাত্রেরই চির-সহচর। আমি অনেক সুখভোগ করিয়াছি।

সুখভোগে আমার আর স্পৃহা নাই। আপনার চরণ-সেবা করিতে পাইলেই আমার পরম সুখ। আমি আপনার এই মহান্ দান-ধর্ম্মে যেরূপ সুখানুভব করিতেছি, এমন আর কিছুতেই হই না। বহুপুণ্যফলে আপনার ন্যায় ত্যাগী ও উদার-হৃদয় স্বামী পাইয়াছি।"

দানবীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অপরিণতবয়স্কা মহিষীর মুখে এবম্বিধ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যারপর নাই প্রীত হইলেন এবং আনন্দে তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার প্রাণ স্বর্গীয় সুখে ভরিয়া উঠিল। মহর্ষির আদেশে তাঁহাদের আর অন্তঃপুরে স্থান নাই, রাত্রি প্রভাতেই স্থানান্তরে যাইতে হইবে, ইহা শুনিয়াও শৈব্যা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পুণ্য-প্রতিমা শৈব্যা শিশু-পুত্র রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া স্বামীর সহিত রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপ দীনবেশে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিয়া,

নগরবাসী নরনারীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল এবং সকলেই তাঁহাদের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা সকলকেই সান্ত্বনা দিয়া, তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া চলিলেন। যে শৈব্যা সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর অধীশ্বরের মহিষী, সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস পায় না, যিনি দীন-দুঃখীগণকে অকাতরে রাশি রাশি ধনরত্ন দান করিয়াছেন, আজ তিনি ভিখারিনীর ন্যায় সামান্য বেশে পদব্রজে প্রবাসে যাইতেছেন! এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে সকলের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য বালকবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবাক্যে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। যিনি চিরকাল বিবিধ সুখ-সম্ভোগে লালিত, দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না, শত শত অশ্ব, গজ, রথাদি যাঁহার জন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে, আজ তিনি পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছেন! এই প্রকার আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তনেও তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই,—পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন

বদন। হাঁটিতে হাঁটিতে পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ন্যায় পা দু'খানি লালবর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া অবিরাম রক্তপাত হইতেছে, তবুও সেই অবিচলিত ভাব—মুখে অপ্রসন্নতার, কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই! অবশেষে তাঁহারা ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং একটী সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার অধীশ্বর মহারাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্র সহ আজ জীর্ণ কুটীরবাসী এবং ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ তাঁহাদের উপজীবিকা! ইহাতেও কিছুমাত্র কষ্টবোধ নাই—তবে একমাত্র ভীষণ চিন্তা—বিশ্বামিত্রের ঋণ। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, মহারাজ নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কোথাও কোন কাজ পাইলেন না, ঋণ পরিশোধের কোন উপায়ই হইল না। কি করিবেন, কি করিয়া ঋণমুক্ত হইবেন, বিশ্বামিত্রকে কি বলিয়া উত্তর দিবেন—এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

একমাস—গণা ত্রিশ দিন, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, কিন্তু ঋণশোধের কিছুই করিতে পারিলেন না।

মাস পূর্ণ হইবামাত্র মুনিবর সেই দিনই কুটীর দ্বারে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজ যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, মুখে একটীও কথা বলিতে পারিলেন না, বিমনার ন্যায় তপোধনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র যখন শুনিলেন, মহারাজ তাঁহার ঋণশোধের কোন উপায় করিতে পারেন না, তখন তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নানারূপ কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন। মহর্ষির সেই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া মহারাজের হৃৎকম্প হইতে লাগিল, ভয়ে জড়সড় হইয়া গেলেন, একটী কথাও মুখ হইতে বাহির হইল না।

এমন সময়ে ধর্ম্ম-পরায়ণা শৈব্যা গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া কুটার-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তাৎকালিক দীপ্তিময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই বিশ্বামিত্র চমকিত হইলেন। বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া, শৈব্যার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়হীন মুনি তাঁহার সম্মুখেই মহারাজকে কর্কশবাক্য বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমাদের কোন কথাই শুনিব না। যদি ইচ্ছা হয়, আজই আমার টাকা দাও। আর না দিলেই বা শুন্‌বো কেন? আজ

যে কোন উপায়েই হউক, আমার টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। আমি তো আর মহাজনী করি নাই যে, রোজ রোজ তাগাদা করিতে আসিব ?” মহারাজ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। কি বলিবেন, কিরূপেই বা ঋণশোধ করিবেন—কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। মহারাজের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া, পতিপরায়ণা শৈব্যা আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না,—চক্ষু হইতে দর্ দর্ বেগে জল পড়িয়া তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। তিনি মুনিবরের পদতলে পতিত হইয়া কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, “মহর্ষি! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ত সবই দেখিতেছেন। আমার একটী অনুরোধ রাখুন। আমাদের তিন জনকে আপনার দাসদাসী করিয়া রাখুন। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হয়, ততদিন আমরা আপনার গৃহে দাসত্ব করিব। ইহা ভিন্ন ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উপায় দেখি নাই। আপনার ঋণ আপনিই পরিশোধ করিয়া লউন।” এই কথা শুনিয়া মুনিবর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্ম্মম

হৃদয় এই প্রকার করুণ ক্রন্দনে একটুও বিচলিত হইল না। তিনি বলিলেন, "আমি বনবাসী ঋষি, দাসদাসী লইয়া আমি কি করিব? বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই আর ফল মূল আহার করি। আমার দাসদাসীর প্রয়োজন কি? আমি তোমাদিগকে একটা কথা বলি, শোন। এই সহরে অনেক বড় লোক আছেন। তাঁহাদের দাস দাসীরও প্রয়োজন হয়। যদি তোমাদের একান্তই ঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা থাকে, কোন বড় লোকের বাড়ীতে চেষ্টা দেখ না কেন? আর এখানে ত প্রত্যহই হাটে দাসদাসী বেচা কেনা হয়। হাটে গেলেই ক্রেতা পাওয়া যাইবে।" এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা যেন আশার আলোক দেখিতে পাইলেন, কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া হাটে বিক্রীত হইবার জন্য বাহির হইলেন। বিশ্বামিত্র মনে করিয়াছিলেন, এইখানেই ধর্ম্মের পরীক্ষার যবনিকা পতন হইবে। কিন্তু রাজা ও রাজমহিষী ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সত্য পালনের জন্য ঈদৃশ নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিতেও ক্ষুণ্ণ নহেন দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন।

দাসদাসীর হাট বসিয়াছে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার মহিষী শৈব্যা দাসদাসী বেশে হাটে উপস্থিত! অনেক খরিদ্দার এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সেই দেবোপম মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই সাহস করিয়া সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্রেতাগণ চলিয়া যাইতেছে। অবশেষে শৈব্যা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট ৫০০ স্থবর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত হইলেন এবং উহা বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিলেন! যে শৈব্যা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পাটরাণী, শত শত দাসদাসী যাঁহার আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত, এমনই বিধিলিপি যে, তিনি স্বয়ং আজ দাসী! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন। তাঁহার শিরে যেন বজ্রনিপতিত হইল—কে যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড টানিয়া বাহির করিতে লাগিল—মাথা ঘুরিয়া পড়িল—সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন—পা টলিতে লাগিল—

সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মহারাজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, বিশ্বামিত্র পূর্ব্ববৎ কঠোর সম্ভাষণে তাঁহার নিকট অবশিষ্ট পাঁচ শত মুদ্রা চাহিলেন। এতক্ষণে যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। বাস্তবিকই, সেরূপ না করিলে হরিশ্চন্দ্র বোধ হয়, একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। তখনই ঋণের কথা মনে পড়িল, অবিলম্বে ঋণ পরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন এবং এক চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া ঋণ-মুক্ত হইলেন! হায়রে অদৃষ্ট! অযোধ্যার অধিপতি হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডালের দাস—চণ্ডালের সঙ্গে ঘাটে ঘাটে শবদাহ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন! মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এই প্রকার সত্যনিষ্ঠা এবং পুণ্যশীলা শৈব্যার ঈদৃশ পতি-ভক্তি দেখিয়া মহর্ষি অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রথমে অতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তিনি

স্বামীর ঋণের অর্দ্ধেকও পরিশোধ করিতে পারিলেন বলিয়া, মনে অপার আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম অতি যত্নের সহিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সদাশয় ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নী অতি নীচ প্রকৃতির লোক। তাহার অনাবশ্যক কাজের হুকুমে শৈব্যার একদণ্ডও বিশ্রাম করিবার উপায় ছিল না। কোন কাজেই তাহার সন্তোষ নাই। তাহার উপর অকারণ নানারূপ মর্ম্মান্তিক বাক্যজ্বালা। দুঃখের বালক রোহিত ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িলেও একমুঠা খাইতে দেয় না, এমনি নারকী সেই রমণী। দুই বেলা ভাত ডা'ল যাহা কিছু দেয়, তাহাতে একজনেরও পেট ভরিতে পারে না। মাতা পুত্র দুই জনে তাহাই আহার করেন। দুধ, ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য যাহার নিত্য ভক্ষ্য বস্তু ছিল, সেই রোহিত আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত! খাদ্যাভাবে সেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় নধর দেহ দিন দিন শুষ্ক ও মলিন

হইতে লাগিল। বিনাদোষে সেই ননীর পুতলিকে মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিত যে, দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়—পাষাণও গলিয়া যায়। রাজমহিষী দেখিয়াও দেখেন না, অন্তরালে গিয়া কেবল দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করেন। এইরূপ অতি কষ্টে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। এতদূর পরীক্ষাতেও বিধাতার তৃপ্তি নাই। যাহাকে একবার ভাঙ্গেন, যতক্ষণ না ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ছাড়েন না। শৈব্যার পরীক্ষার আজ শেষ দিন। ভগবান্! এরূপ পরীক্ষাতে যেন কাহাকেও পতিত হইতে না হয়। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি ব্রাহ্মণের বাটীর কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। এদিকে রোহিতাশ্ব ফুলের সাজিটী হাতে লইয়া বাগানে ফুল তুলিতে বাহির হইল। কুমার ফুল তুলিতেছে, এমন সময়ে এক বিষধর সর্প একটী ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাহার পায়ে দংশন করিল। রোহিত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শৈব্যা পুত্রের মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া, কপালে করাঘাত করিতে

করিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কাতর বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া গেল, মুখ দিয়া অনর্গল লালা পড়িতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল ও শিথিল হইয়া পড়িল। তাহার পরে যাহা ঘটিল তাহা আর কোন্ মুখে বলিব? সব শেষ হইয়া গেল! শৈব্যার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, আজ খসিয়া পড়িল! আঁধার ঘরের ক্ষীণ আলোকটুকু নির্ব্বাপিত হইল! তাঁহার সকল আশা ভরসা এতদিন পরে একেবারে ফুরাইয়া গেল! নয়নের মণি রোহিত আর নাই! তিনি চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নী ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। এহেন দুঃসময়ে সান্ত্বনা দেওয়া, দুঃখ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, তাহারা এরূপ পাষণ্ড যে, তখনও অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল; এবং অবিলম্বে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হুকুম দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সারাদিন হৃদয়-বিদারক শোকে কাটিল। কি ভাবে

কোথা দিয়া যে কাটিল, শৈব্যা জানিতেও পারিলেন না। সন্ধ্যা বিভীষিকাময় সহচর সহচরী লইয়া সমাগত। অন্ধকার রাত্রি—চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারময়, তাহার উপর ভীষণ দৈবদুর্ব্বিপাক—প্রবল ঝড় ও জল—মধ্যে মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনি। কোন সহায়, নাই—শৈব্যা একাকিনী। কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ভাগ্য যখন মন্দ হয়, তখন সকলেই বাদ সাধিবার সুযোগ পায়। যত প্রকার অমঙ্গল আছে, সকলেই একযোগে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে, করালরূপী সংহার মূর্ত্তি সকল দিক্ হইতেই মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসে ও বিকট অট্টহাস্য করিয়া হৃদয়ে ভীতি সম্পাদন করে। শৈব্যা সকলই বুঝিলেন, কিন্তু কি করিবেন, কোন উপায় ত নাই। এখনই মনিবের হুকুম পালন করিতেই হইবে, না করিলে আর রক্ষা নাই। তিনি প্রকৃতির সেই করালরূপী অভ্যাপাতের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, অঞ্চলের নিধি সোণার পুতলি রোহিতের মৃত দেহ লইয়া শ্মশান ঘাটের দিকে চলিলেন। এখন আর তাঁহার কোন ভয় নাই। কিসের

ভয়, কা'কে ভয়, কার জন্যই বা ভয় ? সকল ভীতিই এখন তাঁহার নিকট পরাজিত। যাঁহাদের জন্য তাঁহার জীবন ধারণ, যাঁহাদের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার ভীতি, তাঁহারা আজ কোথায় ? সকলেই ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তবে আর ভয় কিসের ? নিজের প্রাণের জন্য ? প্রাণ লইয়া কি হইবে ? যাঁ'দের মুখের দিকে চাহিয়া জীবন ধারণ, তাঁহারা ত আর নাই। তবে এ প্রাণে আবশ্যক কি ? এইরূপে উন্মাদিনীর ন্যায় নানা চিন্তা করিতে করিতে ঘোর অন্ধকারে একাকিনী মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং রোহিতকে ভূতলে রাখিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি দিঙ্মণ্ডল বিষাদময় করিয়া তুলিল।

ঘাট-চণ্ডাল এরূপ ঘন অন্ধকারময় গভীর রজনীতে রমণীর কাতর বিলাপধ্বনি শুনিয়া, প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইল। তাহার প্রাণটাও যেন কাঁদিয়া উঠিল। অবিলম্বে শৈব্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল। যতই শুনিতে লাগিল, ততই যেন চণ্ডালের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল

পুণ্য-কাহিনী ৪১ পৃষ্ঠা-

হরিশ্চন্দ্র রোহিতকে চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

—আরও কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে লাগিল। এই ঘাট-চণ্ডাল আর কেহ নহে। চণ্ডাল বেশধারী স্বয়ং মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! শৈব্যার এক একটী কাহিনী নিজের জীবনের ঘটনাবলীর সহিত বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয়কে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ উপরি উপরি বিদ্যুতের আলোকে মৃত শিশুর মুখ দেখিতে পাইয়া, নিজ পুত্র রোহিত বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং "রোহিত! রোহিত! এ যে রোহিত! এ যে রোহিত! রোহিত, রোহিত! বাপ্‌রে আমার" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন! শৈব্যা কণ্ঠস্বরে স্বামীকে চিনিতে পারিলেন! তখন দুই জনেই পাগলের মত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজকে দেখিয়া শৈব্যার প্রাণে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল।

তখন দুইজনে স্থির করিলেন যে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কিন্তু তাহা ত

করিতে পারেন না—তাঁহারা যে দাসদাসী, জীবনে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। তাঁহাদের জীবন যে বিক্রীত। মরা হইবে না। তাহা হইলে অধর্ম্ম করা হইবে। তখন উভয়ে পুত্রের সৎকারের জন্য স্বহস্তে চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে, পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দণ্ডায়মান। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, গভীর অন্ধকার গিয়া আকাশে সামান্য আলোক দেখা দিয়াছে। রাজা ও রাণী বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বামিত্রের প্রাণ গলিয়া গেল। তাঁহার চক্ষু হইতে দর্ দর্ ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শোক সংবরণ করিয়া তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কমণ্ডলুর পবিত্র বারি রোহিতের অঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন। রোহিত তৎক্ষণাৎ প্রাণ পাইল। তখন তিনি বলিলেন "মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! মা লক্ষ্মী শৈব্যা! আমি তোমাদের ধর্ম্ম ও সত্য পালনের জন্য যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। তোমরাই ধার্ম্মিক, তোমরাই পুণ্য-মূর্ত্তি। আজ ধর্ম্মেরই জয় হইল। আমি তোমাদের নিকট

পরাজিত। তোমাদের পরীক্ষার আজ শেষ রজনী। আমার আশীর্ব্বাদে ত্রিভুবনে তোমাদের যশোরাশি চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে।" এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় আসিলেন এবং রাজারাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাদের যশোগান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুনিবর শৈব্যার অলৌকিক পতিভক্তির জন্য সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা ও রাণীকে পাইয়া প্রজাগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। দেশের চারিদিকেই উৎসবের ঘটা পড়িয়া গেল। অযোধ্যা নগরী আবার পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কিছুকাল পরে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও পতিব্রতা শৈব্যা দিব্য রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

বেহুলা
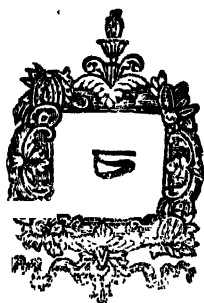
ম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে এক বণিক্ ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে তিনি অতুল ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েছিলেন। রাজার ন্যায় তাঁ'র প্রতিপত্তি। তিনি একজন পরম ভক্ত। শিব ও চণ্ডী তাঁর প্রধান উপাস্য দেবতা। শিব-শক্তির দয়ায় তাঁ'র ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'য়েছিল। তাঁ'র ছ'টী পুত্র ছিল।

চাঁদ সদাগর চণ্ডীর একনিষ্ঠ উপাসক। চণ্ডীর মূর্ত্তি ভিন্ন তাঁ'র ঠাকুর মন্দিরে অন্য কোন দেবদেবীর স্থান নাই। অন্য দেবতার প্রতি তাঁ'র তাদৃশ আস্থাও ছিল না। বিশেষতঃ মনসা দেবীর উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। মনসা শিবের মানস-কন্যা। মহাদেবের ইচ্ছায় তিনি পদ্মবনে আবির্ভূত হন—এজন্য তাঁ'র

আসল নাম পদ্মা। আবার শিবের মানস কন্যা ব'লে অন্য নাম হ'লো মনসা। মহাদেব মানস-কন্যা পদ্মাকে বাড়ীতে আন্‌লেন। তা' দেখে চণ্ডীর রাগ দেখে কে? রাগে তাঁ'র আপাদ-মস্তক জ্ব'লে উঠ্‌লো। তিনি মনে ক'রলেন, মহাদেব নিশ্চয়ই গোপনে কোথায় বিয়ে ক'রেছেন—পদ্মা সেই পত্নীর গর্ভজাত কন্যা। সতীন-কন্যা বোধে চণ্ডী মনসাকে সর্ব্বদা বিষ-নয়নে দেখ্‌তেন—অনবরতই তাঁ'র নিন্দা কুৎসা—কথায় কথায় কলহ। চণ্ডীর এরূপ অযথা অত্যাচার পদ্মা সহ্য ক'রতে না পেরে, তিনিও কোমর বেঁধে লাগ্‌লেন। দিবারাত্র সংসারে রাবণের চুলো জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। চণ্ডী এক দিন ঝগড়া ক'র্‌তে ক'র্‌তে পদ্মার চোখে এমন গুরুতর আঘাত কর্ল্লেন যে, তা'তেই তাঁ'র একটী চোখ নষ্ট হ'য়ে গেল। চণ্ডীর এই রকম দুর্ব্ব্যবহারে পদ্মার অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হ'লো—তিনি এর প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'লেন। মনসা জান্‌তেন, সকলেই ভক্তিভাবে চণ্ডীর পূজো করে। এ তাঁ'র প্রাণে আর সহ্য হ'লো না। সৎ-মা পূজো পায়—আর তিনি পাবেন না কেন? সৎ-মা শিবের পত্নী—

তাই সকলে তাঁ'কে ভক্তি ও ভয় করে। তিনি সং মায়ের চেয়ে কোন্ বিষয়ে হীন ? তিনি ত শিবের কন্যা। তবে তিনিই বা সকলের পূজো পাবেন না কেন ? যে কোন উপায়েই হ'ক, তাঁকে সৎ-মায়ের সমান হ'তেই হবে—তা হ'লেই তাঁ'র গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে, একদিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, "সৎ-মা আমার কি দুরবস্থা ক'রেছে দেখুন—আপনাকে এর একটা প্রতীকার ক'রতেই হবে। আর আমি যাতে সৎ মায়ের মত সকলের নিকট পূজা ও ভক্তি পাই, তা'র ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে।" কন্যার কাতর প্রার্থনায় মহাদেবের মন গ'লে গেল। তিনি ব'ল্লেন "পৃথিবীতে চাঁদ সদাগর নামে প্রতিপত্তিশালী এক বণিক্ আছে। সে চণ্ডীর একনিষ্ঠ ভক্ত। পৃথিবীর সকল লোক তা'র কথা মানে। তা'র ঐশ্বর্য্যও যেমন, প্রতিপত্তিও তেমনি। তুমি যদি কোন গতিকে তা'র বাড়ীতে পূজার পত্তন ক'রতে পার, তা হ'লে পৃথিবীর সকলেই তোমার পূজা ক'র্ব্বে। তুমি আগে তা'র বাড়ীতে পূজার পত্তনের চেষ্টা কর—তা হ'লে তুমিও তোমার সৎ মায়ের সমকক্ষ হবে।"

পিতার নিকট এই কথা শুনে, পদ্মা হৃষ্টমনে চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে নিজের মহিমা জাহির করবার জন্য নানা চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। চাঁদ সদাগর কিন্তু চণ্ডী ও শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে বড় একটা মান্‌তেন না। তাঁ'র মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের নিকট পদ্মার পূজো পাবার আশা বামনের চাঁদ পাওয়ার ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র! পদ্মাকে কিন্তু চাঁদের বাড়ীতে পূজোর পত্তন ক'রে সৎ-মায়ের সমকক্ষ হ'তেই হবে।

এক সময়ে চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করবার জন্য বিদেশে গিয়েছেন, অনেক দিন কেটে গেল, দেশে ফিরেও আসেন না, কোন খবরও নেই। সদাগরের স্ত্রী সনকা চিন্তায় আকুল হ'য়ে প'ড়লেন। চিন্তায় তাঁ'র আহার নিদ্রা নাই। স্বামীর মঙ্গলের জন্য কত দেব দেবীর আরাধনা উপাসনা করেন, কত মানন করেন, চণ্ডীর মন্দিরেই তাঁ'র অধিকাংশ সময় কাটে। একদিন তিনি ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন, এক দেবীমূর্ত্তি তাঁ'র সম্মুখে উপস্থিত। তিনি ব'ল্লেন "সনকা! তুমি স্বামীর জন্য অত কাতর হ'চ্ছ কেন? তোমার স্বামী কুশলে

আছেন। তুমি এক কাজ কর, আজই পদ্মার ষোড়শোপচারে পূজা দাও। তা হ'লে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার স্বামী ফিরে আস্‌বেন। তোমার বাড়ীতে যেন আমার পূজার পত্তন হয়। আমি তোমার অশেষ মঙ্গল ক'রবো।" স্বামী শীঘ্র দেশে ফিরে আস্‌বেন, এই আশায় পতিব্রতা সনকা সেই দিনই অতি ভক্তিভাবে পদ্মার পূজা ক'রলেন। পদ্মা সনকার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে সদাগরকে অল্প দিনের ভিতর দেশে ফিরিয়ে দিলেন।

দেশে ফেরবার সময় একদিন চাঁদ পথের মাঝে মা চণ্ডীর পূজার আয়োজন করেন। সেই সময়ে চণ্ডী তাঁ'র সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে ব'ল্লেন, "ভক্ত চাঁদ! আমি তোমার পূজায় চিরদিনই সন্তুষ্ট। আমার বরে তোমার কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু দেখো, বৎস! পদ্মা যেন তোমার নিকট পূজা না পায়। সে আমার সতীন-কন্যা, তোমার মায়ের সমকক্ষ হ'বার জন্য তোমার বাড়ীতে পূজার পত্তন কর্‌বার চেষ্টায় আছে। তা'র পূজা ক'রলে, তোমার মায়ের অপমান করা হবে। বৎস! পদ্মা যেন তোমার গৃহে কোন মতেই স্থান না পায়।

আমার প্রতি তোমার ভক্তি যেন চিরদিন অটুট্ থাকে।” চণ্ডীর মুখে এই কথা শুনে, সেদিন থেকেই পদ্মা চাঁদের বিষ-নয়নে প’ড়লেন।

অনেক দিনের পর আজ সদাগর দেশে ফিরেছেন। সনকার আর আনন্দের সীমা নেই। স্বামী যে এত শীঘ্র দেশে ফিরে এসেছেন, এ কেবল পদ্মার দয়ায়। পদ্মার উপর সনকার প্রগাঢ় বিশ্বাস, অচলা ভক্তি জন্মাল। তিনি খুব ধূমধাম ক’রে চণ্ডীর ও পদ্মার পূজার আয়োজন ক’রলেন। চাঁদ মন্দিরে প্রবেশ ক’রে ভক্তিভরে চণ্ডীর আরাধনা ক’রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক’রলেন। প্রথমে তিনি পদ্মার ঘট দেখ্‌তে পান না। তিনি শিব-শক্তি ভিন্ন অপর কোন দেবতার পূজা কর্ব্বেন না—সনকা তা’ পূর্ব্ব থেকেই জান্‌তেন। এজন্য তাঁ’র নিকট পদ্মার পূজার উল্লেখ কর্লে‌ন না। কিছুক্ষণ পরে পদ্মা দেবীর ঘটের উপর সদাগরের নজর প’ড়লো। ঘটটী চণ্ডীর মূর্ত্তির পাশেই বসান ছিল। সনকাকে জিজ্ঞাসা ক’রে, যখন জান্‌লেন যে, ওটী পদ্মার ঘট, তখন চাঁদের রাগ দেখে কে? রাগে তাঁ’র সর্ব্ব-শরীর জ্ব’লে উঠ্‌লো—মাথার চুল খাড়া হ’য়ে উঠ্‌লো,

চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ ক'রলো, দাঁত কড়মড় ক'রতে লাগ্‌লেন—একেবারে যেন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রলেন। স্বামীর এই রকম ভয়ানক ভাব দেখে,' সনকা ভয়ে জড়সড় হ'য়ে গেলেন। তাঁ'কে প্রকৃতিস্থ কর্‌বার জন্য কত কাকুতি মিনতি কর্লে'ন, পায়ে ধ'রে কত কাঁদ্‌লেন, কত বোঝালেন—কিছুতেই তাঁ'র ক্রোধের হ্রাস হ'লো না। উন্মত্ত-প্রায় হ'য়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে লাঠি মেরে পদ্মার ঘট চুরমার ক'রে ফেল্লেন। সনকার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে পদ্মাদেবী সশরীরে ঘটের মধ্যে আবির্ভূ'ত হ'য়েছিলেন। লাঠির আঘাত তাঁ'র দেহে পড়ায় তিনি বড়ই ব্যথা পেলেন। সে দিন থেকে সদাগরের উপর তাঁ'র অশুভ দৃষ্টি প'ড়লো।

চাঁদের দুর্ব্ব্যবহারে পদ্মা অত্যন্ত রুষ্ট হ'লেন এবং বল-প্রয়োগে তাঁ'র নিকট পূজো পাবার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সদাগরের বাড়ীর চা'র্‌দিকে হাজার হাজার সাপ পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ী থেকে যে কেউ বেরোয়, সাপ অমনি তাড়া ক'রে ভয় দেখায়। চণ্ডী চাঁদকে এক হেঁতেলের লাঠি দিয়েছিলেন। এই লাঠির এমনি গুণ যে, লাঠি ঘুরুলে তা'র গন্ধে সাপেরা ভয়ে যে যেখানে

পারে পালায়। সাপেদের এই রকম অত্যাচার দেখে, চাঁদ মাঝে মাঝে যেমন হেঁতালের লাঠি নিয়ে তাড়া করেন, অহিকুল আর কোথায় আছে, প্রাণভয়ে দে'ছুট। হেঁতেলের লাঠির ভয়ে তা'রা পালিয়ে গিয়ে পদ্মার কাছে হাজির হ'লো। পদ্মা তখন বাহনদিগে ব'লে দিলেন, "তোমরা চাঁদ সদাগরের বাড়ীর বাইরে লুকিয়ে থাক্‌বে, আর তা'র ছেলেরা যেমনি বাড়ীর বাহির হবে, অমনি তা'দিগে দংশন ক'রবে।" দেবীর আদেশে বাহন সকল সদাগরের বাড়ীর চা'রদিক্ ঘেরে' লুকিয়ে রইলো। চাঁদের ছেলেরা কেউ কোন কাজ ক'র্ত্তে বাইরে গেছে, ঘরে ফেরবার সময় অমনি তা'কে সাপে ছোবল দিলে—সে ছুটে বাড়ীতে এলো, আর কিছুক্ষণ পরে মারা গেল। আবার কেউ হয় ত বাগানে ফুল তুল্‌ছে, সাপ এসে তা'কে দিলে এক ছোবল—তারও সেই একই অবস্থা হ'লো। ইএ রকম ক'রে সকল ছেলেদিগেই সাপে কামড়ে মার্‌তে লাগ্‌লো। সদাগর এক মন্ত্র জান্‌তেন। তার নাম "মহাজ্ঞান মন্ত্র" চাঁদের উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব তাঁ'কে এই "মহাজ্ঞান মন্ত্র" দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্রের এমনি প্রভাব যে, উহা উচ্চারিত হ'লে মরা মানুষ প্রাণ পায়।

তিনি সেই মন্ত্রের জোরে মরা ছেলেদিগে বাঁচাতে লাগ্‌লেন। এমন একবার নয়, দু'বার নয়—সাত সাত বার মরা ছেলেদিগে বাঁচালেন। এবারেও চাঁদের নিকট পদ্মা পরাস্ত হ'লেন।

কিছুতেই চাঁদকে আট্‌তে পাচ্ছেন না দেখে, পদ্মা মহাজ্ঞান মন্ত্রটী তাঁ'র কাছ থেকে হরণ কর্‌বার চেষ্টায় ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন তিনি মায়ারূপ ধ'রে চাঁদের নিকটে উপস্থিত হ'লেন এবং এমন মায়াজাল বিস্তার ক'রলেন যে, সদাগর সব ভুলে গেলেন এবং পদ্মাকে মহাজ্ঞান মন্ত্রটী দিয়ে ফেল্‌লেন। দেবী মহা আনন্দে চ'লে গেলেন। মানবের সর্ব্বনাশ করবার জন্য দেবতারাও কিরূপ ষড়যন্ত্র করেন—মাঝে মাঝে কত ভ্রম করেন! পদ্মার সঙ্গে লড়াই করবার একমাত্র মহাস্ত্র হারিয়ে চাঁদ প্রমাদ গ'ণলেন। কিন্তু এতেও তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হ'লেন না। পদ্মা চাঁদকে নিরস্ত্র ক'রে, তাঁ'র সঙ্গে শত্রুতা করবার মহা সুযোগ পেলেন এবং তাঁ'র সর্ব্বনাশ করবার জন্য আবার বাহনদিগে ছেড়ে' দিলেন। তা'রা অল্পদিনের মধ্যেই সদাগরের ছ' ছ'টী সোণার চাঁদ ছেলেকে মেরে

ফেল্লে। আর তা'দিগে বাঁচাবার অন্য উপায় নেই। সনকা পুত্রশোকে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। সদাগর কিন্তু অবিচলিত! ভীষণ প্রতিহিংসা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকট পুত্রশোকও তাঁ'র হৃদয়ে স্থান পেলে না। তখন থেকে তিনি পদ্মাকে আরও বেশী ঘৃণার চক্ষে দেখ্তেন এবং তাঁ'কে 'চ্যাং মুড়ির কাণি' ব'লে ডাক্তেন। মানুষ এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে পারে দেখে, পদ্মা বিস্মিত হ'য়ে গেলেন এবং স্থির ক'রলেন এমন লোকের নিকট তাঁকে পূজো নিতেই হবে—তবে ত তাঁ'র মহিমা জাহির হবে, তবেই ত তিনি সৎ-মার সমান হবেন।

একটী নয়, দু'টী নয়, উপ্রি উপ্রি ছ' ছ'টী ছেলের মৃত্যুতে সনকা একেবারে শোকে অধীর হ'য়ে পড়্লেন। তাঁ'র হৃদয়াকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হ'য়ে গেল। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন—নিবিড় অন্ধকার। বহু দিন এই রকম দুঃসহ শোক দুঃখে অতিবাহিত হ'লে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ আলোর ন্যায় তাঁ'র শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আবার একটু আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ হ'লো—সনকা আবার গর্ভবতী হ'লেন। কালক্রমে তাঁ'র এক দিব্যকান্তি পুত্র জন্মাল। ছেলেটী যেন দেব-কুমার।

এ রকম ঘর আলো-করা পুত্র পেয়ে, তাঁ'র শোক অনেকটা ক'মে গেল—নিদারুণ শোকতাপের মধ্যে প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হ'লো।

ছেলেটী জন্মেছে বড়ই শুভক্ষণে—রূপও কন্দর্পের মত। শুভদিনে শুভক্ষণে শিশুর নামকরণ হ'লো। বালককে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত দেখে, পুরোহিত ঠাকুর বালকের নাম রাখ্‌লেন লক্ষ্মীন্দ্র। কিন্তু সকলেই তা'কে আদর ক'রে লখিন্দর ব'লে ডাক্‌তো। লখিন্দর শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত দিন দিন বড় হ'তে লাগ্‌লো। সনকা প্রাণে অনেকটা শান্তি লাভ ক'র্লেন। চাঁদের মনে কিন্তু একটুও আনন্দ নাই। তিনি জান্‌তেন পদ্মা সুযোগ পেলেই সেটীকেও মার্‌বেন। সনকার ইচ্ছামত তিনি প্রথমতঃ লখিন্দরের বিবাহ দেবেন না স্থির ক'রেছিলেন। কিন্তু "বিয়ে না দিলে চ্যাং মুড়ির কাণি মনে ক'রবে, আমি তা'র ভয় পেয়েছি, পদ্মার কাছে মাথা হেঁট হবে, কিছুতেই তা' সহ্য ক'রতে পারবো না।" মনে মনে এইরূপ কল্পনা ক'রে, তিনি অবশেষে লখিন্দরের বিবাহ দেবেন স্থির ক'রলেন। সনকা অনেক নিষেধ ক'রলেন। কিন্তু মহাতেজস্বী,

শক্তির উপাসক চাঁদ সদাগর কিছুতেই সে কথায় কাণ দিলেন না। অগত্যা সনকা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। দেশের শ্রেষ্ঠ গণককারকে লখিন্দরের কোষ্ঠী বিচারের জন্য ডাকা হ'লো। তিনি গণনা ক'রে ব'ল্লেন, "লখিন্দরের কোষ্ঠীর ফল অতি খারাপ। বিবাহ-বাসরেই সর্পাঘাতে তা'র মৃত্যু হ'বে।" সনকা এই কথা শুনে' শিউরে উঠ্‌লেন। বিবাহ-প্রস্তাবে বিরত হ'তে স্বামীকে কত অনুনয় বিনয় ক'রলেন। চাঁদ সে কথায় কর্ণপাত ক'রলেন না। তিনি স্থির ক'রলেন, এমন একটী সতী মেয়ের সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে দিতে হবে, যা'র সতীত্ব প্রভাবের কাছে পদ্মার সকল ছল চাতুরিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

এই সময়ে উজানি নগরে সায় বেণে নামে একজন বণিক্ ছিলেন। চাঁদ সদাগরের মত তিনিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাঁ'র বেহুলা নামে এক পরমা-সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁ'র আসল নাম বিপুলা। কন্যা জন্মান অবধি পিতার ধন সম্পত্তি যেন উথ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তাই বাপ আদর ক'রে মেয়ের নাম রাখ্‌লেন বিপুলা। এই বিপুলা হ'তেই বেহুলা নাম দাঁড়ালো।

বেহুলা বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। অল্পকাল মধ্যেই নানা প্রকার কলা-বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে উঠ্লেন। নৃত্য-গীতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এত সুন্দর নাচ্তে পার্তেন, শুন্লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। তিন চারটী জলপূর্ণ কলসী মাথার উপর রেখে নাচের বিবিধ কৌশল দেখাতেন, অথচ এক ফোঁটা জলও চ'ল্কে প'ড়তো না। তাঁ'র নাচ দেখে সকলেই অবাক্ হ'য়ে যেতো। তাই আদর ক'রে সকলে তাঁ'কে 'বেহুলা নাচনী' ব'লে ডাক্তো। দেবতা ব্রাহ্মণেও বাল্যকালাবধি বেহুলার অচলা ভক্তি। দেব-সেবা, বারব্রত, অতিথিসেবা এগুলি তাঁ'র নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। বাপের অগাধ ধন, নিজেও অসামান্য রূপবতী—কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁ'র মনে গর্ব্বের সঞ্চার হয় না—সকলকেই স্নেহ-ভক্তির চোখে দেখেন, মধুর আলাপে সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। তাঁর সেবা-যত্নে সকলেই প্রীত, তাঁর গুণে সকলেই মুগ্ধ। রূপ, গুণ, আনন্দ ও সরলতা তাঁ'তে একাধারে বিদ্যমান।

চাঁদ সদাগর বেহুলার গুণের পরিচয় পেয়ে, তাঁ'র সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দেবেন, মনস্থ ক'র্লেন। এইরূপ স্থির ক'রে, তিনি একদিন উজানি নগরে উপস্থিত

হ'লেন। সায় বেণে চাঁদের প্রতি সমুচিত সমাদর দেখালেন এবং মধুরালাপে ও বিবিধ ভোজ্য-দ্রব্যে তাঁ'র আদর আপ্যায়ন ক'রলেন। কিছুক্ষণ পরে বহুমূল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে বেহুলা চাঁদের সাম্‌নে এসে ব'স্‌লেন এবং ভক্তিভাবে তাঁ'কে নমস্কার ক'রলেন। চাঁদ বেহুলার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিখানি দেখে বড়ই প্রীত হ'লেন। তাঁ'র আকার প্রকার, হাব্‌ভাব, চালচলন, অঙ্গসৌষ্টব সকলই দেবতার ন্যায়। চাঁদ যেমনটী চাইছিলেন, এ মেয়েটী ঠিক সেইরূপ। ভাব্‌লেন, এমন মেয়েকে ঘরে নিয়ে না গেলে, তাঁ'র ধন ঐশ্বর্য্য সকলই বৃথা। মনে মনে শিব-শক্তিকে স্মরণ ক'রে ধান দূর্ব্বা দিয়ে বেহুলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। তখনই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে এনে শুভ বিবাহের দিন স্থির হ'লো। পরদিন চাঁদ দেশে ফিরে এলেন এবং সনকার নিকট ভাবী পুত্র-বধূ বেহুলার গুণের পরিচয় দিলেন। চম্পক নগরে আবার উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেল—চার্‌দিকেই বিবিধ আমোদ প্রমোদ হ'তে লাগ্‌লো।

উজানি নগরেও আনন্দের স্রোত বইতে লাগ্‌লো।

সায় বেণের একমাত্র কন্থার বিয়ে। তাঁ'র ত ধনের সীমা নাই। মেয়ের বিয়েতে তিনি বহুদূর দেশ থেকে কত রকম বাজনা বাদ্যি, নাচ গান, রং তামাসা আনিয়েছেন। আত্মীয় কুটুম্বগণ পক্ষাধিক পূর্ব্ব হ'তে সায়বেণের বাড়ী গুল্‌জার ক'র্‌ছে। এমন আনন্দোৎসব আর কখনও এদেশে হয় না। এইরূপে মহা জাঁকজমকের সহিত লখিন্দর ও বেহুলার বিয়ে হ'য়ে গেল।

পরদিন চাঁদ ছেলে বৌ নিয়ে মহা আনন্দে দেশে ফিরে এলেন। গণককারের ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ ক'রে, পদ্মার রোষ-কটাক্ষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি বিয়ের পূর্ব্বেই একখানি লোহার পাঁচিল দেওয়া ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছেলে বৌকে সেই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ঘরের চার্‌দিকে ধাউ ধাউ ক'রে আগুন জ্ব'লছে। শত শত লোক ঘরের চারদিক্ ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে—সকলেই সতর্ক, ঘরে সাপ না ঢুক্‌তে পারে—সকলেই জেগে আছে। স্বয়ং চাঁদও হেতালের লাঠি হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। বেহুলাকে তিনি আগেই আভাস দিয়েছিলেন। বেহুলাও

জেগে আছেন—সারা রাত স্বামীর পদ-সেবা ক'চ্ছেন। লখিন্দর অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ঘুমিয়ে প'ড়লেন। এইরূপে রাত্রি এক প্রহর, দুই প্রহর, তিন প্রহর নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। চাঁদ মাঝে মাঝে ঘরের দরজার কাছে এসে সাড়া করেন এবং বেহুলাকে ভরসা দিয়ে যান। রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে, আর অল্প কয়েক দণ্ড কাট্‌লেই রাত্রি প্রভাত হয়। সারা রাত জেগে সকলেই অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, সকলের চোখেই তন্দ্রা এলো। বেহুলাও তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লেন। তিনি আর ব'স্‌তে পার্‌ছেন না। তাঁর চোখ বুজে এলো, অবশেষে স্বামীর পায়ের কাছে শুয়ে প'ড়লেন। পদ্মা স্থির ক'রলেন, শত্রুতা সাধনের এই উপযুক্ত অবসর। তখন তিনি এক অতি সূক্ষ্মকায় বিষধর সর্পকে ত্বরায় পাঠিয়ে দিলেন। দরজার নিকটে একটী অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। যে মিস্ত্রী লোহার ঘর তৈরী ক'রেছিল, পদ্মা তা'কে একটী ছিদ্র রাখ্‌তে ব'লেছিলেন। মিস্ত্রী পদ্মার রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই গর্হিত প্রস্তাবেও সম্মত হ'লো। সকলের অলক্ষিতে একটী

ছোট গর্ত্ত ক'রে, মোম দিয়ে তা'র মুখ বন্ধ ক'রে রেখে দিলে। সেই ছিদ্র দিয়ে এক বিষধর সাপ লখিন্দরের ঘরে প্রবেশ ক'রে, তাঁর পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমের ঘোরে তার গায়ে পা দেওয়া মাত্র সাপটা ফণা তুলে তাঁ'র পায়ে ছোবল দিলে। জ্বালায় অস্থির হ'য়ে লখিন্দর চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। চীৎকার শুনে সকলেরই চমক ভাঙলো। বেহুলাও তাড়াতাড়ি উঠে ব'স্‌লেন। সকলেই দরজার কাছে ছুটে এলো—যা শুন্‌লে, তাতে তাদের প্রাণ উড়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই লখিন্দর মারা গেলেন। চম্পক নগরী আবার গভীর শোকে আচ্ছন্ন হ'লো। সনকার হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদে পাষাণ পর্য্যন্ত গ'লে যেতে লাগ্‌লো। দৈবের লিখন কে খণ্ডন ক'র্ব্বে? বিধি কপালে যা লিখেছেন, তা ফ'ল্‌বেই ফ'লবে। চাঁদ কিন্তু পাষাণে বুক বেঁধে রইলেন—তিনি পূর্ব্ববৎ অচল, অটল, স্থির, গম্ভীর। যখন প্রাণের ভিতরটা কেমন কেমন করে, তখন "জয় মা চণ্ডী, জয় শিব-দুর্গা, জয় শিব শম্ভো" নাম উচ্চারণ ক'রে, মনকে আবার দৃঢ় করেন।

চোখের সাম্‌নে এইরূপ নিদারুণ দৃশ্য ঘট্‌তে দেখে, বেহুলা প্রথমে অধীর হ'য়ে প'ড়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনিও শ্বশুরের মত পাষাণে বুক বাঁধ্‌লেন। প্রভাতে লখিন্দরের মৃতদেহ সৎকারের জন্য লোকজন দরজার নিকট এসে উপস্থিত। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই তা'দিগে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দিলেন না। তিনি শ্বশুরকে একটী ভেলা তৈরী ক'রে দিতে ব'ল্লেন। ভেলায় চেপে' মৃত স্বামীকে অমৃতের দেশে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে আন্‌বেন, শ্বশুরের নিকট তিনি এই কথা ব'লে পাঠালেন।

পুত্রবধূর প্রার্থনা শুনে, সদাগর বড় বড় কলাগাছ কাটিয়ে মস্ত বড এক ভেলা তৈরী করিয়ে দিলেন। লোকজন এসে লখিন্দরের মৃতদেহ সেই ভেলার উপর শুইয়ে দিলে। বেহুলা যাবার আগে সকলকে বল্লেন, "তোমরা আমাকে উন্মাদিনী মনে ক'রো না। আমি যা ব'লে যাচ্ছি, বর্ণে বর্ণে তা' ফ'ল্‌বে—আমি নিশ্চয়ই মরা স্বামী বাঁচিয়ে আন্‌বো। আরও ব'লে যাচ্ছি, লোহার ঘরের কপাট ছ'মাসের মধ্যে খুল্‌বে না, বরণডালায় যে প্রদীপ জ্ব'ল্‌ছে, ছ'মাসের মধ্যে তা'

নিভ্‌বে না, হাঁড়িতে জল ও চা'ল রেখে এসেছি— বিনা জ্বালেই ভাত হ'য়ে থাক্‌বে—আমার স্বামীকে খাওয়াব ব'লে ভাত রাঁধবার আয়োজন ক'রেছিলাম, স্বামীকে বাঁচিয়ে এনে সেই ভাত খাওয়াব—আর ঘরের বাইরে ভাজা কড়াই ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম— ছ'মাস পরে গাছ হবে—তা'তে ফুল ও ফল হবে। যে দিন দেখ্‌বে, ঘরের কপাট খুলে গেছে, প্রদীপ নিভে গেছে, হাঁড়িতে বিনা জ্বালে ভাত হ'য়ে র'য়েছে, ভাজা কড়াইয়ের গাছ বেরিয়েছে—সেই দিন জেনো, আমি স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফির্‌বো। আমার একটী কথাও মিথ্যা হবে না। বেহুলার এই সকল কথা শুনে সকলেরই প্রাণে একটা আশার সঞ্চার হ'লো। সতীর তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি দেখে সকলেই চমৎকৃত হ'য়ে গেল।

বেহুলা গুঞ্জরী নদীর জলে স্নান ক'রে, শশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে, ভিজে কাপড়ে এলো চুলে ভেলার উপরে গিয়ে ব'সলেন। স্বামীর মস্তক নিজের কোলে রেখে' যোড় হস্তে ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে ভগবানের নিকট জানালেন, "হে সতীপতি! আমি যদি সতী হই, স্বামী পদে যদি আমার

পুণ্য-কাহিনী ৬৩ পৃষ্ঠা—

বেহুলা লখিন্দরকে লইয়া অমৃতের দেশে যাইতেছেন

অভয়া প্রেস, কলিকাতা

একান্ত মতিগতি থাকে, তা' হ'লে এই ভেলা আমাকে অমৃতের দেশে নিয়ে যাবে।" এই কথা উচ্চারিত হ'তে না হইতেই তর্ তর্ শব্দে ভেলা গুঞ্জরীর উপর ভেসে চ'ল্লো। সকলে পতিব্রতা বেহুলার জয়ধ্বনি ক'রতে লাগ্‌লো। যতক্ষণ দেখা গেল, সকলেই একদৃষ্টে বেহুলার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল।

ভেলা অবিরাম ভেসে ভেসে যাচ্ছে। গ্রাম, নগর, প্রান্তর, বন, উপবন অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। একে একে দণ্ড, প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস অতিক্রান্ত হ'তে লাগলো। সতী অনাহারে অনিদ্রায় এক বস্ত্রে এক ভাবে মৃত পতি কোলে নিয়ে কোন্ অজানা দেশে যাচ্ছেন। পথে কতই বাধা বিঘ্ন ঘট্‌তে লাগলো—মরামানুষ দেখে কাক শকুনি চার দিক্ থেকে উড়ে এসে ঘেরে ফেল্লে—বনের ধার দিয়ে যাবার সময় শিয়াল ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু তাড়া ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। অসহায়া রূপবতী বালিকা দেখে' কত দুষ্ট লোক কু-অভিপ্রায়ে তাঁ'কে প্রলোভন দেখাতে লাগ্‌লো, কেহ কেহ বা বল-প্রকাশে উদ্যত হ'ল—কিন্তু সতীর তেজের নিকটে কেহই অগ্রসর হ'তে পারলে না—কেহ

তাঁ'র অঙ্গ স্পর্শ ক'র্ত্তেও সাহস পেলে না। পতি-গতপ্রাণা বেহুলা সকল বিপদ্‌কেই উপেক্ষা ক'রে চ'লেছেন। কিছু দিন পরে লখিন্দরের দেহ প'চে উঠ্‌ল, গায়ে পোকা বিজ্‌ বিজ্‌ ক'র্‌ছে, পচা মাংস খ'সে খ'সে প'ড়ছে, দুর্গন্ধে চারদিক্ ভ'রে উঠেছে। কিন্তু বেহুলা নির্ব্বিকার, অচল, অটল। তিনি যত্নপূর্ব্বক হা'ড়গুলি ধুয়ে' আঁচলে বাঁধ্‌তে লাগ্‌লেন।

ভেলাটীও দিন দিন প'চতে লাগ্‌লো। কলাগাছ-গুলি একটী একটী ক'রে খ'সে খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে। এইরূপ ভাবে কিছুদিন যায়, এমন সময়ে একদিন তিনি এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ্‌লেন। দেখ্‌লেন এক ধোপানী মাথায় এক বস্তা কাপড় ও কোলে একটী ছেলে নিয়ে নদীর ধারে এলো। ছেলেটা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো দেখে, তা'র প্রতি ধোপানী এমন তীব্র দৃষ্টিতে চাইলে যে, সে তৎক্ষণাৎ ম'রে গেল। ধোপানী তখন স্বচ্ছন্দে কাপড় কাচ্‌তে লাগ্‌লো। কাপড় কাচা শেষ হ'লে, সে বালকের কাছে গিয়ে এমন অপূর্ব্ব করুণ দৃষ্টিতে চাইলে যে, বালক তখনই বেঁচে উঠ্‌লো এবং হাস্‌তে হাস্‌তে 'মা' 'মা' ব'লে

মায়ের কোলে গিয়ে উঠ্‌লো। বেহুলা এই দৃশ্য দেখে' প্রাণে বড়ই ভরসা পেলেন—স্থির ক'র্‌লেন, এই-ই অমৃতের দেশ। কিন্তু সেদিন আর ধোপানীকে কিছু ব'ল্লেন না। পরদিনও সেই একই ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'র্‌লেন। তখন তিনি ধোপানীর নিকটে গিয়ে তা'র পা দু'টী জড়িয়ে ধ'রলেন এবং তাঁ'র মৃত স্বামী যা'তে প্রাণ পায়, তার একটা উপায় ক'রে দিতে অনুনয় বিনয় ক'রতে লাগ্‌লেন। বেহুলার কাতর ক্রন্দন দেখে ধোপানীর প্রাণ গ'লে গেল এবং তাঁ'কে আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে ক'রে স্বর্গে নিয়ে গেল। ধোপানী ব'ল্লে "যদি নাচ গানে মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'র্ত্তে পার, তা হ'লে তোমার স্বামীর জীবন ফিরে পাবে। বেহুলা তাতেই সম্মত হ'লেন। এই ধোপানীর নাম ছিল নেতা। নেতা মনসার কি এক সম্পর্কে মাসী। নেতা বেহুলার সকল কথা দেবরাজ ইন্দ্রের গোচর ক'রে লখিন্দরকে বাঁচাবার একটা উপায় ক'রে দিতে অনুরোধ ক'র্‌লেন। দেবরাজ বেহুলার সতীত্বের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হ'লেন এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'রে বর

পাবার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতের আয়োজন ক'রে দেবতাদিগে নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

আজ ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নৃত্যগীত হবে। তেত্রিশকোটি দেবতা নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেবদেবীগণ যে যার জায়গায় আসনগ্রহণ ক'রেছেন। মর্ত্তবাসিনী বেহুলা আজ নৃত্যগীত ক'র্ব্বে। তাই সকলেই আগ্রহ ক'রে সভায় এসেছেন। এত বড় সভা স্বর্গে অনেক দিন হয় না। এলেন না কেবল পদ্মা, তাঁ'র বোধ হয় আস্‌তে লজ্জা হ'য়েছিল। প্রথমে অপ্সরাগণ, তার পর কিন্নরীগণ, তার পর গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যগীত হ'লো। যাঁরা নাচগানে প্রতিদিনই দেবগণের মনোরঞ্জন করেন, তাঁদের নাচগান আজ দেবগণের কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছিল না। সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তে বেহুলার নাচগান দেখ্‌বার জন্য প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। দেবতাদের আগ্রহাতিশয্য দেখে, দেবরাজের ইঙ্গিতে নেতা ধোপানীর ইসারায় বেহুলা উঠে দাঁড়ালেন। সভার মধ্যে দাঁড়াবামাত্রই তাঁ'র মাথা ঘুরে গেল। যেন চোখে জাল প'ড়ে গেল, ভির্ম্মি লাগার মত হ'য়ে গেলেন। তা হবারই ত কথা। তেত্রিশকোটী দেবতার

সভায় কুলবধূ হ'য়ে নির্লজ্জার মত নাচগান ক'র্তে উঠেছেন, এ কথা মনে জাগরূক হবামাত্রই তিনি একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেলেন। ক্ষণমধ্যে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে পতির চরণযুগল ধ্যান কর্‌লেন এবং তাঁতেই তন্ময় হ'য়ে গেলেন। পরক্ষণে দেখ্‌লেন আশে পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, উপরে নীচে সর্ব্বত্রই যেন স্বামী ব'সে র'য়েছেন। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তিনি স্বামীময় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র ভয়ও কেটে গেল। দেবগণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তিনি নাচগানের এমন নূতন নূতন কায়দা কৌশল দেখাতে লাগ্‌লেন যে, তা' দেখে শুনে সুরমণ্ডলী স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন! এরূপ নাচ তাঁ'রা কখনও দেখেন না, এরূপ সুললিত গানও কখন শুনেন না—সকলেই একবাক্যে তাঁ'র কলা বিদ্যা শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

তার পর নেতার ইঙ্গিতে তিনি স্বামীর মৃত্যু-ঘটনা গীতিছন্দে এরূপ করুণ সুরে গাইতে লাগ্‌লেন যে, তা' শুনে দেবতামণ্ডলীর চক্ষু হ'তে ঝর ঝর ক'রে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হ'তে লাগ্‌লো। অবসর বুঝে,

দেবরাজ ইন্দ্র তখন মহাদেবের নিকট লখিন্দরের জীবন প্রার্থনা কর্‌লেন। চণ্ডীও সতীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য অনুনয় বিনয় ক'রতে লাগ্‌লেন। মহাদেব বেহুলার নৃত্যগীত দেখে এরূপ খুসী হ'য়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মনসাকে ডেকে পাঠালেন এবং অবিলম্বে লখিন্দরকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌বার জন্য আদেশ দিলেন। বেহুলা তখন মৃত স্বামীর হাড়গুলি আঁচল থেকে সভার মাঝখানে ধীরে ধীরে ঢেলে দিলেন। মনসা একটী একটী ক'রে সেই হাড়গুলি যথাযথ ভাবে সাজালেন এবং মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে তা'তে কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ ক'র্‌লেন। লখিন্দর তখনই জীবনলাভ ক'র্‌লেন এবং সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে প্রণাম ক'র্‌লেন। বেহুলার প্রার্থনায় তাঁ'র ছ'টী ভাসুরও পুনর্জীবন লাভ ক'রলেন! মনসা বেহুলাকে ব'ল্লেন "তুমি প্রতিদিন আমার পূজা ক'রবে। তোমার শ্বশুরও যেন আমার পূজা করেন। যদি না করেন, তুমি আমার কাছে চ'লে এসো"। বেহুলা মনসার আজ্ঞা পালন ক'রতে স্বীকৃত হ'লেন। বেহুলার কথায় মনসা খুব সন্তুষ্ট হ'লেন।

যে বেহুলা সতীত্ব-প্রভাবে মৃত স্বামীর ও ভাসুরগণের

প্রাণ বাঁচালেন—প্রাণ পা'বামাত্র সেই ভাসুরগণই তাঁ'র চরিত্রে সন্দিহান হ'লো—যেহেতু তিনি একাকিনী ছয় মাস পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনি নীচমনা পুরুষ জাতি! বেহুলা দেবগণ-সমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষা দিয়ে তাঁ'র শুচিতা প্রমাণ ক'র্‌লেন। দেবদেবীগণ তাঁ'র সতীত্ব দেখে ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তখন তিনি দেবগণপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, তাঁদের নিকট বিদায় নিলেন এবং স্বামী ও ভাসুরদের নিয়ে দেশে ফির্‌লেন।

আজ ছ'মাস পূর্ণ হ'লো। চম্পক নগরের সকলে দেখ্‌লে যে লোহার কপাট খুলে গেছে, প্রদীপ নিভে গেছে, বিনা জ্বালে ভাত হ'য়ে র'য়েছে, বাইরে ভাজা কড়াইএর গাছ হ'য়েছে। এই সব দেখে, সকলে ভাব্‌লে যে, আজ বেহুলা স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে দেশে ফির্‌বে। সকলেই উৎসুক হ'য়ে একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লে যে সত্য সত্যই বেহুলা স্বামী ও ছয় ভাসুরকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফির্‌ছেন। দেখে তা'রা অবাক্ হ'য়ে গেল! আজ কোন লোকই বাড়ীতে নেই, সকলেই রাস্তার দিকে—সকলেই সেই সতী রমণীকে দেখে জীবন সার্থক কর্‌বার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর

হ'চ্ছে। চম্পক নগরী আজ মহানন্দে মেতে উঠেছে। সকলেরই মুখে সতীসাধ্বী বেহুলার সতীত্বের কথা— আর মাঝে মাঝে তাঁ'র জয়ধ্বনি। চাঁদ সদাগর ও সনকার আনন্দের সীমা নেই। ছেলেদিগে আর এ জীবনে দেখ্‌তে পাবেন, এ আশা তাঁদের আদৌ ছিল না। আজ সেই সোণার চাঁদ সাত সাতটী ছেলেই ঘরে ফিরে এসেছে। বিধবা বধূগণ মৃত স্বামিগণকে ফিরে পেয়ে অপার আনন্দ পেলেন। সদাগর ও সনকা বালিকা পুত্রবধূকে কত আদর, আশীর্ব্বাদ ও সুখ্যাতি ক'র্‌লেন তা' ব'লে শেষ করা যায় না। বেহুলা তখন পদ্মার আদেশ শ্বশুরকে জানালেন। সাত সাতটী মরা ছেলেকে পেয়ে, তিনি পদ্মার উপর সকল হিংসা ত্যাগ ক'র্‌লেন। খুব ধূমধামের সহিত চাঁদ বাড়ীতে মনসা পূজার পত্তন ক'র্‌লেন। চাঁদকে পূজো ক'র্ত্তে দেখে, সকল বাড়ীতেই মনসা পুজা আরম্ভ হ'লো। মনসার বরে লখিন্দর ও বেহুলা দিব্যরথে আরোহণ ক'রে সশরীরে স্বর্গে চ'লে গেলেন।

সাবিত্রী
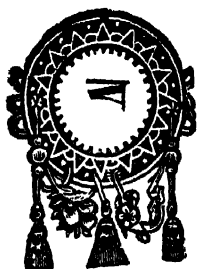
হু প্রাচীন কালে মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও শিবভক্ত। রাজার ধন ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। তা' হ'লে কি হয়? বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তবুও সন্তানাদি হ'লো না—মনে যার পর নাই অশান্তি। যে সংসারে ছেলে পিলে নেই, সেখানে আর সুখ কোথায়—রাজ্য ঐশ্বর্য্যেই বা দরকার কি? এইরূপে অতি মনোকষ্টে দিন যায়। মহারাজ অশ্বপতি প্রতিদিন পূজার সময় মহাদেবের নিকট প্রাণের ব্যথা জানান। অবশেষে ভক্তবৎসল ভোলানাথ রাজার পূজা আরাধনায় সন্তুষ্ট হ'লেন—তাঁর একটী পরমাসুন্দরী কন্যা হ'লো। মেয়েটীকে পেয়ে তাঁ'র বড়ই আনন্দ। কন্যার নাম রাখ্‌লেন সাবিত্রী। সাবিত্রী দিন দিন বড় হ'তে লাগ্‌লেন। বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র সুকোমল অঙ্গে রূপলাবণ্য ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। অল্প বয়সেই তিনি নানা রকম শিল্প ও কলাবিদ্যায় সুনিপুণা হ'লেন। তা' ছাড়া বারব্রত ধর্ম্মকর্ম্মেও তাঁ'র অতিশয় আগ্রহ।

রাজার একটী মাত্র মেয়ে—বাপ মা'র বড় আদরের ধন। তা'র সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য তাঁ'রা সর্ব্বদাই যত্নবান্। মেয়ের যা'তে আনন্দ, তা' ক'রতে দিতে তাঁদের কোন আপত্তিই নেই। যখন যা' আবদার করেন, তখনই দেন। রথে চ'ড়ে রাজ্যের চার্‌দিকে বেড়িয়ে বেড়াতে সাবিত্রীর বড় আনন্দ। সঙ্গিনীদের নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যান। মাঝে মাঝে খুব দূর দূর স্থানে যান। রাজার মেয়ে—কোন ভয়ও নেই—বাপমায়ের আপত্তিও নেই। একদিন তিনি মুনিদের আশ্রমে বেড়াতে গেলেন। যেতে যেতে দেখ্‌লেন, মুনিকুমারগণ বনে ফলমূল তুল্‌ছেন, কাঠ কাট্‌ছেন। সাবিত্রী একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'দের মধ্যে একজন বালক দেখ্‌তে এমন সুপুরুষ ছিল যে, তাঁকে দেখ্‌লে দেবকুমার ব'লে ভ্রম হয়—এমন তাঁ'র সুন্দর গঠন—এমনই তাঁর দিব্যকান্তি।

তিনি সেই দেবতা-বিনিন্দিত অপরূপ মূর্ত্তিখানির দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁ'র উপর সাবিত্রীর কেমন এক সম্প্রীতি জন্মাল। সে দিন ফিরে এলেন। কিন্তু সেই দেবোপম বালকটীকে ভুল্‌তে পার্‌লেন না। প্রায় প্রতিদিনই মুনিদের আশ্রমে যান—অনেকক্ষণ সেখানে থাকেন—সেই মুনিকুমারটীকে দেখে' নয়ন সার্থক করেন, কখন কখন বা কাছে গিয়ে তাঁ'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন, তাঁ'র কিছু কিছু কাজ ক'রে দেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে খুব সদ্ভাব হ'লো। তাঁ'র সুন্দর কান্তিখানি দেখে, তাঁ'র মুখে নানা রকম ধর্ম্মোপদেশ শুনে, সাবিত্রী একেবারে বিভোর হ'য়ে যেতেন। সন্ধ্যা হ'লেই বাড়ীতে ফিরে আসেন বটে, কিন্তু তাঁ'কে না দেখে তিনি একদণ্ডও সুস্থ থাকৃতে পার্‌তেন না। বালকের রূপে ও গুণে সাবিত্রী এমনই মুগ্ধ হ'য়ে ছিলেন যে, মনে মনে তাঁ'কে পতিত্বে বরণ ক'রে ফেল্লেন।

এই বালক অবন্তীর রাজা দ্যুমৎসেনের একমাত্র পুত্র। তাঁ'র নাম সত্যবান। সত্যবান জন্মগ্রহণ কর্‌বার অল্পদিন মধ্যে রাজা দ্যুমৎসেন অন্ধ হন। তাঁ'র

শত্রুগণ এই সুযোগে রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁ'কে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হ'য়ে রাজা মদ্রদেশে এসে মুনিদের আশ্রমে বাস ক'রতে লাগ্‌লেন। সংসারে তাঁ'রা তিনটী প্রাণী—অন্ধ রাজা, রাজমহিষী ও তাঁ'দের একমাত্র পুত্র সত্যবান। সত্যবান বন থেকে ফল মূলাদি আহরণ করেন, তা'তেই কোন রকমে দিনপাত হয়।

একদিন সাবিত্রী বাড়ীতে ফিরে এসে মায়ের কাছে প্রাণের সকল কথা জানালেন। রাণী মেয়ের মনোভাব রাজার গোচর ক'র্‌লেন। রাজা এইকথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেন, মনে মনে একটু রাগও ক'র্‌লেন। এহেন রূপলাবণ্যময়ী কন্যাকে কোন্ প্রাণে একজন অজানা অচেনা বনবাসী ঋষিকুমারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন? তাঁ'র মত ঐশ্বর্য্যশালী রাজার পক্ষে এও কি সম্ভব হয়? প্রথমে কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। সাবিত্রীকে অনেক ক'বে বুঝা'লেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি পিতার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লেন না। তিনি ব'ল্লেন "সত্যবানকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রেছি। সত্যবান ভিন্ন আর কা'কেও বিয়ে করা

কোন মতে সম্ভব নয়।” কন্যার কথা শুনে মহারাজ মহাগণ্ডগোলে প'ড়লেন। কি ক'র্‌বেন কিছুই স্থির ক'রতে পার্‌লেন না। গভীর চিন্তা এসে তাঁ'র হৃদয়কে আলোড়িত ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন দেবর্ষি নারদ রাজা অশ্বপতির রাজসভায় এসে উপস্থিত হ'লেন। রাজা দেবর্ষির সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা ক'চ্ছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী পিতার সম্মুখে এলেন। দেবর্ষি সাবিত্রীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখে মনে মনে বড়ই প্রীত হ'লেন এবং ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তখন মহারাজ অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের নিকট কন্যার মনোভাব জানালেন এবং তাঁ'র মতামত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। নারদ মুনি মহারাজের অনুরোধে সাবিত্রী ও সত্যবানের রাশি গণনা ক'রে তাঁ'কে ব'ল্লেন, “সত্যবান অতি অল্পায়ু, বিয়ের দিন হ'তে এক বৎসরের মধ্যে তিনি মারা যাবেন। অতএব এ বিবাহে কোন মতেই অনুমোদন করা যায় না।” তিনি স্বয়ং সাবিত্রীকে সত্যবানের অল্পায়ুর কথা উল্লেখ ক'রে সঙ্কল্প হ'তে বিরত হবার জন্য নানা প্রকারে বুঝালেন। কিন্তু

তা'তেও কোন ফল হ'লো না। তিনি অবিচল। এই অল্প বয়সেই বিধবা হবেন, এর চেয়ে অনুতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে? এ হেন নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা জেনেও তিনি একটুও ভীত বা বিচলিত হ'লেন না। তা' হবেনই বা কেন? তিনি যে পূর্ব্বেই সত্যবানকে বরণ ক'রেছেন। ভাগ্যে যাই বা হোক্ না কেন, তা' ব'লে কি অন্য মত ক'র্‌তে পারেন? মনে মনে এইরূপ আলোচনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তিনি আবেগ ভরে নির্লজ্জার মত সভার মাঝখানেই মনোভাব প্রকাশ ক'রে ফেল্লেন এবং ব'ল্লেন, "দেবর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার অবিদিত কিছুই নেই। আপনি জানেন ত যে আমি পূর্ব্ব হ'তেই সত্যবানকে মনে মনে বরণ ক'রেছি। এবং তদবধি তিনি আমার হৃদয়াসনের একমাত্র অধীশ্বর, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ধ্যান। তবে কেন আর আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন? আর যদি আমার কপালে বৈধব্য ভোগ লেখা থাকে, সে ত বিধিলিপি—কে তা' খণ্ডন ক'র্ব্বে? যা'র সঙ্গেই আমার বিবাহ হোক্ না কেন, আমার কর্ম্মফল, আমার ভোগাভোগ, আমার সুখ দুঃখ—আমার কপালের লিখন—সকলই আমার পিছু

পিছু ফির্‌বেই ফির্‌রে। কেউ তা' রদ ক'রতে পার্ব্বে না। বিবেচনা করুন, এ মর-জগতে চিরজীবীই বা কে? আয়ুঃশেষে সকলেরই ত সেই একই পরিণাম—কালের করাল কবল থেকে কেউ ত কখনও অব্যাহতি পায় না। তবে কেউ বা দু'দিন আগে, আর কেউ বা দু'দিন পরে। সকলকেই যখন একই চরম দশায় লীন হ'তে হ'বে, তখন ক্ষণিক সুখের জন্য কিহেতু চিরকলঙ্ক পশরা বহন ক'র্‌বো? এই অনিত্য সংসারে সতী নারীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সতীত্বরত্নকে চিরতরে জলাঞ্জলি দেবো? মুনিবর! এই হীনমতি বালিকার প্রগল্‌ভতা মাপ ক'র্‌বেন, আমি কিছুতেই ধর্ম্ম পথ হ'তে বিচলিত হ'তে পার্ব্বো না।" দেবর্ষি নারদ বালিকা সবিত্রীর মুখে ঈদৃশ অশেষ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে, যার পর নাই প্রীতি লাভ ক'র্‌লেন, তাঁর কথার কোন উত্তর দিতে বা প্রতিবাদ ক'রতে পার্‌লেন না। পরে সাবিত্রীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেখান হ'তে প্রস্থান ক'র্‌লেন।

অবশেষে রাজা অনন্যোপায় হ'য়ে কন্যার প্রস্তাবে অনুমোদন ক'রলেন। সত্যবানকে তপোবন থেকে আনালেন এবং শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁ'র সহিত সাবিত্রীর

বিবাহ দিলেন। মহা আড়ম্বরে বিবাহ হ'য়ে গেল। পরদিন প্রভাতে সাবিত্রী সত্যবানের সহিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ ক'র্‌লেন এবং হর্ষমনে বনে গমন ক'রলেন। রাজঅট্টালিকা ছেড়ে পর্ণ-কুটীরে গিয়েও তাঁ'র পরম আনন্দ। সত্যবান প্রতিদিন নানা রকম ফল মূল আনেন। সাবিত্রী ভক্তিভরে সে সকল দ্রব্য শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও সত্যবানকে খেতে দেন। সকলেই এরূপ আগ্রহের সহিত আহার করেন, যেন এমন জিনিষ তাঁ'রা আর কখনো খান না। সেই একই জিনিষ—সেই বনফলই—সাবিত্রীর ভক্তি-প্রভাবে অমৃতের মত বোধ হ'তো। সাবিত্রী সংসারের সকল কাজই অতি সন্তর্পণে, অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করেন। কায়মনে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা, ভক্তিভরে দেব আরাধনা এবং সমাদরে ব্রাহ্মণ অতিথির তৃপ্তিসাধন—এগুলি তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এইরূপে অতি পবিত্র ভাবে তিনি দিন যাপন করেন। তাঁ'কে পেয়ে সকলেই বনবাসের ক্লেশ একেবারে ভুলে গেলেন। তাঁ'র গুণে পর্ণ-কুটির স্বর্গভূমির ন্যায় পরম সুখের স্থান হ'য়ে উঠ্‌লো, তাঁ'র কর্ম্মকুশলতায় সেই

বনভাগ নন্দনকাননের মত শোভা ধারণ ক'র্‌লো। বনবাসিনী মুনিপত্নীগণ তাঁর রূপে, গুণে, সরলতায় ও মধুরালাপে একেবারে বিমোহিত হ'য়ে গেলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যায়। সকলেরই সুখে দিন কাটে। সাবিত্রীও অতি পবিত্র ভাবে দিন কাটান। কিন্তু তাঁ'র অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বেদ, কিছুতেই তা'র লাঘব হয় না। এক এক ক'রে যতই দিন যায়, ততই তাঁ'র প্রাণের ভেতরটা হু হু ক'রে ওঠে, তাঁ'র হৃৎপিণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে, তাঁ'র অন্তরাত্মা কেঁদে কেঁদে ওঠে,—সে বেদনা যে কিরূপ ক্লেশদায়ক তা' কে জানে, কে বোঝে? তবুও তিনি কারো কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। এমন কি, তাঁ'র মুখে মুহূর্ত্তের জন্যও কেউ বিষণ্ণ ভাব দেখেন না। কেবল অহরহঃ সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌কে স্মরণ করেন এবং তাঁ'র উপর সকল ভার অর্পণ করেন।

এইরূপে এক বৎসর প্রায় পূর্ণ হ'তে চ'ল্লো। আর তিন দিন মাত্র বাকি। আজ সাবিত্রী তিন দিন ব্যাপী এক ব্রত আরম্ভ ক'রলেন। সেই ব্রতের নাম ত্রি-রাত্র ব্রত। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠে স্নানাদি সমাপন

ক'রে, ভক্তিভরে দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করেন, ব্রাহ্মণ অতিথিগণকে পরম যত্ন সহকারে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যে ও দক্ষিণাদি দিয়ে পরিতুষ্ট করেন। এই রকমে বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁ'র দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো। তিন দিনই অনাহারী, এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। কিন্তু এতেও তাঁ'র কোন কষ্টই নেই। পূর্ব্বের মত অকাতরে সংসারের সকল কাজই নিজ হাতে করেন। আজ তৃতীয় দিবস। আজই ত্রিরাত্র ব্রত উদ্‌যাপন হবে।

সত্যবান প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে ফলমূলাদির জন্য বাহির হন। আজ কিন্তু সকালে যাওয়া ঘ'টলো না। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়েছে। এমন সময়ে তিনি কুড়ুলখানি কাঁধে নিয়ে পিতামাতার অনুমতি নেবার জন্য তাঁ'দের কাছে উপস্থিত হ'লেন। বেলা শেষ হ'য়ে গেছে দেখে, মা নিষেধ ক'রলেন। আহা! মায়ের প্রাণ কিনা! স্নেহময়ী মায়ের প্রাণে যে সর্ব্বদাই পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা। সে দিন তাঁ'র অন্তরাত্মা জান্‌তে পেরেছে। পুত্রকে নানা প্রকারে বোঝালেন। সত্যবান তাঁ'কে সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌লেন, "মা, আপনি

চিন্তা ক'র্‌ছেন কেন? আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো, আপনি ভয় ক'র্‌বেন না। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোন অমঙ্গলই হবে না।" মা'কে এইরূপে বুঝিয়ে তিনি বেরুচ্ছেন। পতিগত-প্রাণা সাবিত্রী এই কথা শুনে, স্বামীর সঙ্গ নিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলেই নিষেধ ক'র্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর সঙ্গ ছাড়্‌লেন না। তিনি যে আজ স্বামীকে ছাড়্‌তে পারেন না। সতী স্বাধ্বী সব জেনে শুনে কি আজ স্বামীকে একা বনে পাঠিয়ে দিয়ে, ঘরে থাক্‌তে পারেন? স্বামী শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন সত্য, কিন্তু যদি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁ'র কোন বিপদ্‌, কোন অমঙ্গল হয়? —তাঁ'র প্রাণে সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা। অবশেষে তাঁ'র কাতর প্রার্থনায় সকলেই সম্মতি দিলেন।

সাবিত্রী স্বামীর পিছু পিছু বনের মাঝ-খান দিয়ে যাচ্ছেন। বনভূমির নানা রকম শোভা সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই প্রাণে শান্তিলাভ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। তাঁ'রা অনেক দূরে গিয়ে প'ড়্‌লেন। সত্যবান ফল মূল তুল্‌তে তুল্‌তে যাচ্ছেন। সাজিটী যখন নানা রকম ফল মূলে পূর্ণ হ'লো, তখন সেটী

সাবিত্রীর নিকট রেখে, কুড়ুল খানি নিয়ে একটী গাছে উঠ্লেন। কিছু কাঠ সংগ্রহ হ'লেই তাঁরা ঘরে ফির্বেন। কাঠ কাট্তে কাট্তে গাছের উপরেই হঠাৎ তাঁ'র মাথার অসুখ হ'লো। সে কি ভয়ানক যন্ত্রণা! ঠিক যেন বৃশ্চিক দংশনের মত অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্লো। তাঁ'র মাথা যেন খ'সে যেতে লাগ্লো—প্রাণ যায়—যাতনায় ছট্ ফট্ ক'র্তে লাগ্লেন! সাবিত্রী সত্যবানের এইরূপ অবস্থা দেখে শুনে ভয়ে কাঁটা হ'য়ে গেলেন। তাঁ'কে কোন গতিকে গাছ থেকে নেমে আস্তে ব'ল্লেন। সত্যবান অন্য উপায় না দেখে, অতি কষ্টে নীচে নেমে এলেন এবং সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে প'ড়্লেন। সাবিত্রী অতি যত্নে তাঁ'র সেবা ক'র্তে লাগ্লেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না—উপশম হওয়া দূরের কথা—যাতনা বাড়্তে লাগ্লো। তখন দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা সাবিত্রীর স্মরণ হ'লো। তিনি সকলই বুঝ্লেন, অতি কাতর ভাবে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক্তে লাগ্লেন। তাঁর সকল চেষ্টা, কাতর প্রার্থনা, সকলই নিষ্ফল হ'লো। বিধির লিখন—আজ তাঁ'র

জীবনের শেষ দিন! অল্পক্ষণ পরেই সত্যবানের দেহপিঞ্জর হ'তে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'লো।

বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা হয় হয় হ'য়েছে, এমন সময়ে সত্যবান সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে চির-নিদ্রায় নিমগ্ন! পত্নীর কোলেই স্বামীর মৃত্যু!—কি সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কি সেই নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনা! সতী রমণীর তাদৃশ প্রাণের ব্যথা কে বুঝ্‌বে? ভগবান্! এরূপ দারুণ মর্ম্ম-বেদনা যেন আর কেউ না পায়! আর কা'কেও যেন বুঝ্‌তে না হয়, ঠাকুর! চোখের জলে সাবিত্রীর বসন সিক্ত হ'য়ে গেল। গভীর শোকে চারদিক্ ঘোর অন্ধকারময় দেখ্‌ছেন, আর আকুল প্রাণে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছেন।

ধীরে ধীরে বেলাটুকু শেষ হ'য়ে গেল। বৃক্ষের ছায়া সেই বনভূমিকে পূর্ব্ব হ'তেই আবৃত ক'রে ফেলেছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রজনী। অল্পক্ষণ মধ্যেই চারদিক্ নিবিড় অন্ধকারময় হ'য়ে উঠ্‌লো। একে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রজনী—নিবিড় বন—তার উপর একাকিনী—কোলে মৃত স্বামী—এ রকম সঙ্কট অবস্থাতেও সাবিত্রীর মনে অণুমাত্র ভীতির উদ্রেক হ'লো না!

ভয়? সে ত দূরের কথা, তাঁ'র প্রাণ স্বতীত্ব তেজে যেন ভ'রে উঠ্‌লো। শরীর থেকে এক দিব্য জ্যোতিঃ বেরুতে লাগ্‌লো। তিনি জান্‌তেন, যমদূতগণ এসে এখুনি তাঁ'র স্বামীকে নিয়ে যাবে। মনে মনে স্থির ক'র্‌লেন, কোন মতেই পতিকে ছাড়্‌বেন না।

রাত্রির গভীরতা---তমসার ভীষণতা—বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সতীর মনের তেজও যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। সত্যবানের মৃত্যু-খবর যমরাজের নিকট পৌঁছিল। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য দূতগণকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। যমদূতগণ রাজার হুকুম পেয়ে এঁটে সেঁটে কোমর বেঁধে বীর-দর্পে সত্যবানকে নিয়ে যাবার জন্য সেই বনে এলো। কিন্তু কেউ কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস কর্‌ল না। সতীর তেজের নিকট তা'দের সকল বল-বিক্রম লোপ পেয়ে গেল। যখন দেখ্‌লে এ সতী নারী, এর কাছে সহজে এগুতে পারা যাবে না, অথচ রাজার হুকুম পালন ক'র্‌তেই হবে, তখন তা'রা ভয় দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধারের মতলব ক'র্‌তে লাগ্‌লো এবং সাবিত্রীকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য নানারকম অঙ্গ-বিকৃতি ক'রে ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। একে ত যমরাজের অনু-

চরদের কেমন খুপসুরৎ চেহারা! সেই সুডৌল চেহারায় এঁকে বেঁকে দাঁত বের ক'রে অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গি ক'র্‌তে ক'র্‌তে তা'রা বিকট চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। সেরূপ চেহারা দেখ্‌লে বোধ হয়, মহা মহা বীরগণও ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে—ভির্ম্মিলাগা হ'য়ে যায়! কিন্তু পতিগত-প্রাণা সাবিত্রীকে কিছুতেই বিচলিত কর্‌তে পার্ল্লে না। তখন তা'রা হা'র মেনে' ফিরে গেল এবং যমরাজের কাছে আগা গোড়া সকল কথা নিবেদন ক'র্‌ল। দূতগণের মুখে এই কথা শুনে, ধর্ম্মরাজ স্বয়ং দ্রুতপদে সেই বনে এলেন। সত্যবানের নিকট অগ্রসর হ'য়ে সাবিত্রীকে ব'ল্‌লেন, "তোমার স্বামীর কালপূর্ণ হ'য়েছে—আমি এঁ'কে নিয়ে যেতে এসেছি।" যমরাজের আদেশ শুনে সাবিত্রীর প্রাণ উড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে যোড়হাতে কত স্তব-স্তুতি, কাকুতি-মিনতি ক'র্‌লেন। যমরাজ কিছুতেই কর্ণপাত ক'র্‌লেন না। সত্যবানকে বেঁধে নিয়ে চ'ল্লেন। পতির এরূপ অবস্থা দেখে' সাবিত্রী আকুল হ'য়ে প'ড়্‌লেন। তিনিও পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মরাজ পিছু ফিরে

দেখেন যে সাবিত্রী আস্‌ছেন। তাঁ'কে দেখে ব'ল্‌লেন "সাবিত্রি, কি জন্য আমাদের সঙ্গে আস্‌ছ? তোমার স্বামীর কালপূর্ণ হ'য়েছে—তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন—তার জন্য চিন্তা ক'রে কি ফল হবে? সকল জীবই কালপূর্ণ হ'লে ধরা-বাস হ'তে চ'লে যায়—এ ত জগতের নিয়ম। তুমি ফিরে যাও, আমাদের সঙ্গে এসে কোনও লাভ নেই। বরং যাতে তোমার পতির ঊর্দ্ধগতি হয়, তার চেষ্টা করগে'।" ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনে, সাবিত্রী করযোড়ে নিবেদন ক'র্‌লেন—

"সত্য বটে তথ্য তব সব জানি আমি,
মাতা-পিতা ভাই বোন কেবা পত্নী স্বামী।
ত্যজে জীব ধরা-বাস কাল পূর্ণ যবে,
আয়ুঃশেষে স্থান কারো নাহি হয় ভবে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলে নর সুখ দুঃখ পায়,
কর্ম্মের অধীন সবে, কারো বশ নয়।
নিজেই নিজের বন্ধু সুকর্ম্মের ফলে,
নানা দুঃখ ভুঞ্জে নর কুকর্ম্ম করিলে।
ধর্ম্মপথে সুখ লাভ না হয় খণ্ডন,
অধর্ম্ম দুঃখের মূল শাস্ত্রের বচন।

ধর্ম্মরাজ—বালিকা সাবিত্রীর মুখে এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ পুণ্য-কথা শ্রবণ ক'রে, পরম পরিতোষ লাভ ক'র্ল্লেন এবং ব'ল্লেন, ''সাধ্বি সতি সাবিত্রি! পৃথিবীতে তোমার মত পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী অতি বিরল, ধন্য তোমার নারী-জন্মে, ধন্য তোমার জনক জননী, ধন্য তোমার শ্বশুর কুল, ধন্য তোমার পতিভক্তি! পুণ্য-শীলা সাবিত্রি! আমি তোমার ধর্ম্মভাবে পরম প্রীত হ'লাম। এখন তোমার ইচ্ছানুরূপ বর চাও। তবে স্বামীর জীবন প্রার্থনা ক'রো না।" যমরাজের ইচ্ছায় সাবিত্রী অপুত্রক পিতার পুত্র কামনা ক'র্ল্লেন। ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁ'র মনোমত বর দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে তাঁ'কে ঘরে ফিরে যেতে আদেশ ক'র্ল্লেন।

সাবিত্রী কহিল, "শুন ধর্ম্ম নরপতি,
ত্যজিবারে তব সঙ্গ নহে মম মতি।

স্বরগ সমান গণি' সাধুসঙ্গবাস,
কেন দেব! তাহে মোরে করহ নিরাশ।

ভাগ্যবলে পাই আজ ধর্ম্ম-দরশন,
প্রাণভ'রে হেরি' তোমা জুড়াই নয়ন।

ধর্ম্মে হেরি তবু বদ্ধ কর্ম্মের সংহতি,
জানিনু নিশ্চয়, বিধি বাম মম প্রতি।"

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর মুখে এরূপ গভীর জ্ঞানের কথা শুনে, অধিকতর প্রীতি লাভ ক'র্লে'ন এবং আরও একটী বর দিতে চাইলেন। সাবিত্রী প্রার্থনা ক'র্লে'ন, "আমার অন্ধ শ্বশুর যেন চক্ষুলাভ করেন।" যমরাজ তখনই সেই বর দিলেন এবং ঘরে ফিরে যাবার জন্য তাঁ'কে অনুরোধ ক'র্‌লেন। তখন সাবিত্রী বল্‌লেন—

"গৃহবাসে আর মোর নাহিক বাসনা,
কি হেতু আমারে প্রভু করিছ ছলনা।
নশ্বর সংসার মাঝে ধর্ম্ম সার ধন,
আশীর্ব্বাদ কর দেব! ধর্ম্মে থাকে মন।"

পুণ্যবতী সাবিত্রীর মুখে এইরূপ শাস্ত্র-কথা শুনে ধর্ম্ম-রাজ বিশেষ আনন্দ লাভ ক'র্লে'ন এবং এবারেও একটী বর দিতে চাইলেন। তখন সাবিত্রী প্রার্থনা ক'র্লে'ন, "দেব! আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত, তিনি যেন হৃত রাজ্য ফিরে পান।" ধর্ম্মরাজ তখনই সাবিত্রীর বাসনা পূর্ণ ক'র্লে'ন এবং ঘরে ফিরে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ক'র্লে'ন। সাবিত্রী করযোড়ে পুনরায় নিবেদন ক'র্লে'ন—

পুণ্য-কাহিনী ৮৮ পৃষ্ঠা—

সাবিত্রী ধর্ম্মরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

"কৃপা করি শুন দেব! মম নিবেদন,
খণ্ডন না হবে যাহা বিধির লিখন।
মায়া-মোহে অন্ধ জীব ত্যজি নিত্য ধন,
মায়ার বাঁধনে বাঁধে আপন চরণ।
অসার সংসার শুধু সার ধর্ম্ম পথ,
ধর্ম্ম বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ।
চিন্তার অনলে দগ্ধ এই মম মন,
শান্তি দাও দগ্ধ প্রাণে, জুড়াক জীবন।"

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর মুখে নিজের স্তুতি-বাক্য শুনে নিরতিশয় আনন্দ লাভ ক'র্লেন। সাবিত্রীর এই প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি ভাব দেখে, আত্মবিস্মৃত হ'য়ে গেলেন এবং সত্যবানের প্রাণলাভ ব্যতীত অন্য যে কোন মনোমত বর প্রার্থনা ক'র্তে ব'ল্লেন। সাবিত্রী আকার ইঙ্গিতে ধর্ম্মরাজের মনোভাব বুঝ্তে পেরে, প্রকারান্তরে মৃত পতির জীবন চেয়ে নিলেন। ব'ল্লেন, "দেব! আপনি যদি এতদূর দয়া প্রকাশ ক'র্লেন, তবে আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন পুত্রবতী হই—সত্যবানের ঔরসে আমার যেন শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে—পাঁচ বৎসর অন্তর যেন এক একটী পুত্র হয়—এই বর দিন।"

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর স্তব-স্তুতিতে এরূপ প্রীত ও বিভোর হ'য়েছিলেন যে, তাঁ'র প্রার্থনার মর্ম্ম উপলব্ধি ক'র্‌বার আগেই "তথাস্তু" ব'লে বর দিলেন। তারপর তিনি সাবিত্রীকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য অশেষ বিশেষে অনুরোধ ক'র্‌লেন এবং সত্যবানকে নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। সাবিত্রী ধর্ম্মরাজের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে করযোড়ে নিবেদন ক'র্‌লেন, "দেব! দয়া ক'রে সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্র জন্মাবার বর দিয়েছেন। আপনার বাক্য কোন মতেই খণ্ডন হবার নয়। তবে কেন আবার আমার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ ক'র্‌ছেন, দয়াময়!" এতক্ষণে ধর্ম্মরাজের হুঁস হ'লো, তিনি সাবিত্রীর কথা শুনে যেন একটু লজ্জিত হ'লেন এবং ব'ল্লেন "পতিপরায়ণা সাবিত্রি! এ তিন ভুবনে তুমিই সতীর শিরোরত্ন। তোমার পতি-ভক্তি দেখে, আমি পরম প্রীত হ'লাম। পতি-ভক্তি-প্রভাবেই আজ তুমি মরা স্বামীকে বাঁচালে। পতির জীবন রক্ষার জন্য তুমি যে ত্রি-রাত্র ব্রত পালন ক'র্‌ছো, তোমার নামানুসারেই এই ব্রত "সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী-ব্রত" নামে ভুবনে খ্যাত হ'বে। আজকের তিথিতে অর্থাৎ

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন এই ব্রত পালন ক'র্তে হবে। যে পতিব্রতা নারী এই ব্রত পালন ক'র্বে, পরকালে তা'কে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ক'র্তে হবে না। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দীর্ঘজীবী হও এবং বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যে পরম সুখে কালযাপন কর; পরকালে তোমরা বিষ্ণুলোকে যাবে।" এই কথা ব'লে তিনি সাবিত্রীর হাতে সত্যবানের অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ জীবনটী অর্পণ ক'র্লেন এবং তাঁ'র পতিভক্তির ভূয়সী প্রশংসা ক'র্তে ক'র্তে চ'লে গেলেন। স্বর্গ থেকে দেবদেবীগণ উৎসুক নয়নে সাবিত্রীর কার্য্যাবলী দেখ্ছিলেন। তাঁকে এই রকম ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে দেখে, তাঁ'রা ধন্য ধন্য ক'র্তে লাগ্লেন।

ধর্ম্মরাজের নিকট স্বামীর জীবনটী নিয়ে সাবিত্রী অতি দ্রুতপদে সেই বনের মধ্যে গেলেন এবং সত্যবানের দেহে সূক্ষ্ম দেহটী স্পর্শ করান মাত্র দু'টী দেহ মিশে গেল। সত্যবান তখনই প্রাণ পেলেন—ঘুম থেকে জাগরিত হওয়ার মত উঠে ব'স্লেন। এত যে ব্যাপার হ'য়ে গেছে, কিছুই জানেন না, বুঝ্তেও পারেন না। "অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বনের মধ্যে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, অন্ধকার রাত্রি—

ঘরে ফের্‌বার উপায়ও নেই, তাঁদের না দেখে বাপ মা কিরূপ কাতর হ'বেন"—এইরূপ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আকুল হ'য়ে পড়্‌লেন। তখন উভয়ে গাছের উপরে উঠে—কোন প্রকারে রাতটুকু কাটালেন এবং সকাল না হ'তে হ'তেই ঘরে ফিরে গেলেন। সাবিত্রী বাড়ী পৌঁছেই শ্বশুর শাশুড়ীর চরণ বন্দনা ক'র্‌লেন এবং দেখ্‌লেন যমরাজের বরে অন্ধ শ্বশুর চক্ষু লাভ ক'রেছেন। শ্বশুর শাশুড়ী ও আর আর সকলে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, সাবিত্রী আগা গোড়া সকল কথা ব'ল্‌লেন। এই কথা শুনে সকলে তাঁ'কে ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। শাশুড়ী এমন গুণের বৌকে কোলে তুলে শত শত চুমো খেলেন, কতই আদর প্রশংসা ক'র্‌লেন। ধর্ম্মরাজের বরে অল্পকাল মধ্যেই সত্যবান শত্রুদিগে পরাস্ত ক'রে, রাজ্য ফিরে পেলেন—সাবিত্রীর অপুত্রক পিতার একটী পুত্র সন্তান জন্মাল—তাঁ'র সতীত্ব প্রভাবে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল দুই-ই উজ্জ্বল হ'লো। বহুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে সাবিত্রী-সত্যবান দিব্য রথে চেপে বিষ্ণুলোকে গমন ক'র্‌লেন।

পুণ্য-কাহিনী ৯২ পৃষ্ঠা-

সাবিত্রী-সত্যবানের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

চিন্তা।

চীন কালে অযোধ্যা নগরে শ্রীবৎস নামে একজন অতি ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন ; তাঁ'র মহিষীর নাম চিন্তা ; স্বামীর ন্যায় চিন্তাও অতি পুণ্যবতী ছিলেন। দেব-আরাধনা, বারব্রত, দানধ্যান, ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে অতি পবিত্র ভাবে ও পরম সুখে তিনি দিন যাপন করেন। তাঁ'র রূপলাবণ্যেরও সীমা ছিল না। এরকম সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখে দেবতাদেরও হিংসা হ'তো।

এই সময়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এক মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। লক্ষ্মী ও শনি দু'জনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এই বিষয় নিয়ে বিষম বিবাদ হ'চ্ছে। দেবতারা কেউই মীমাংসা ক'র্‌তে পাচ্ছেন না। তখন

তাঁ'রা সিদ্ধান্ত ক'র্লেন, শ্রীবৎস রাজা মহাপুণ্যবান্— তাঁ'কেই মীমাংসার ভার দেওয়া হ'ক্। লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন এবং শ্রীবৎসকে মধ্যস্থ মান্লেন।

দেবগণের এই বিষম আদেশ কর্ণগোচর হ'বামাত্র মহারাজ শ্রীবৎস প্রমাদ গ'ণ্লেন, গভীর চিন্তায় তিনি একেবারে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্লেন। কি ক'র্বেন, কিছুই স্থির ক'র্তে পা'র্লেন না। অথচ দেবতাদের আদেশ কিছুতেই লঙ্ঘন করা যাবে না। একজনকে বড় ব'ল্তেই হবে। তা' হ'লে প্রকারান্তরে আর একজনকে ছোট বলা হ'বে। কিন্তু যাঁ'কেই ছোট বলা হবে, তিনিই একেবারে ক্ষেপে উঠ্বেন।

এইরূপে চিন্তাযুক্ত মনে অন্তঃপুরে গেলেন এবং রাজমহিষীকে সকল কথা ব'ল্লেন। রাজমহিষীও দেবতাদের এই বিষম আদেশের কথা শুনে, যার পর নাই চিন্তিত ও ভীত হ'য়ে প'ড়্লেন। তখন রাজা ও রাণী যুক্তি ক'রে স্থির ক'র্লেন, "দেবতা দু'জনকে মুখে কিছু বলা হবে না। প্রকারান্তরে কে ছোট বা বড় জানাতে হবে—একজনের জন্য এক

খানি সোণার সিংহাসন, আর একজনের জন্য এক খানি রূপার সিংহাসন তৈরী করান হ'ক। যিনি বড়, তাঁ'কে সোণার সিংহাসনে, আর যিনি ছোট তাঁ'কে রূপার সিংহাসনে ব'স্‌তে দেওয়া হবে।" এইরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে তাঁ'রা একজন স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠালেন এবং একখানি সোণার ও আর একখানি রূপার সিংহাসন তৈরী ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌লেন। স্বর্ণকার যথা সময়ে সিংহাসন দু'খানি প্রস্তুত ক'রে রাজার কাছে নিয়ে এলো। রাজা তাঁ'র ডানদিকে সোণার সিংহাসন খানি এবং বাঁ দিকে রূপার সিংহাসন খানি রেখে দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে লক্ষ্মী ও শনি রাজা শ্রীবৎসের রাজ-সভায় উপস্থিত হ'লেন। রাজা তাঁ'দের যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন এবং আসন গ্রহণ ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন —লক্ষ্মীকে সোণার সিংহাসন খানি এবং শনিকে রূপার সিংহাসন খানি দিলেন। লক্ষ্মী দেবী মহারাজা শ্রীবৎসের আচরণে বড়ই প্রীত হ'লেন এবং মনে মনে একটু হাস্‌লেন। শনি ঠাকুরকে রূপার সিংহাসন দেওয়ায় তিনি আভাসে সকলই বুঝ্‌লেন—মনে মনে

বিষম চ'টে গেলেন—কিন্তু মুখে কিছু ব'ল্লেন না—ভাব্লেন, এখনও একটু আশা আছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শনি ঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে, তাঁ'দের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উত্থাপন ক'র্লেন। মহারাজ শ্রীবৎস সহসা কোন উত্তর দিতে পার্লেন না—কেমন বাধ বাধ বোধ হ'চ্ছিল। শনি রাজের পুনঃ পুনঃ আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ্যে কিছু না ব'লে, তাঁ'র দেওয়া আসনের উল্লেখ ক'রে ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত ক'র্লেন। লক্ষ্মী দেবী সোণার সিংহাসন পেয়ে ঐরূপ উত্তর পাবেন, আগে থেকেই প্রতীক্ষা ক'র্ছিলেন। এখন শ্রীবৎসের মুখে আশানুরূপ উত্তর পেয়ে যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'লেন এবং রাজাকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ক'র্লেন। শনিরাজ কিন্তু রাজার মুখে এই কথা শুনে রাগে উন্মত্ত-প্রায় হ'য়ে উঠ্লেন এবং ব'ল্লেন, "তুমি আমাকে যেমন সকলের সমক্ষে হেয়ঃ প্রমাণ ক'র্লে, এর জন্য তোমাকে সমুচিত শাস্তি ভোগ ক'র্তে হবে। অল্প দিন মধ্যেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্তে পার্বে, আমি কেমন ছোট!" এই কথা ব'লে শনি বেগে রাজসভা পরিত্যাগ ক'র্লেন। তিনি এমন

বেগে বেরিয়ে গেলেন, যেন সভার মাঝে একটা প্রবল ঝড় ব'য়ে গেল! শনির কোপ দেখে', শ্রীবৎস বড়ই ভীত হ'য়ে প'ড়্লেন। শ্রীবৎসের মনোভাব বুঝ্তে পেরে তখন লক্ষ্মীদেবী তাঁকে ব'ল্লেন, "বৎস, শ্রীবৎস! তুমি কোন ভয় ক'রো না। আমি সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা ক'র্ব।" এইরূপে প্রবোধ দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

সেই দিন থেকেই শনি শ্রীবৎসের খুঁটিনাটি দোষ খুঁজে বেড়াতে লাগ্লেন—একটু খুঁৎ পেলেই তাঁ'র দৃষ্টিটুকু ফেলেন আর কি! দেবতা বিরোধী হ'লে মানুষ ক'দিন সাবধান হ'য়ে, ক'দিক্ সাম্লে চ'ল্তে পারে? মহারাজা শ্রীবৎস অজ্ঞাতসারে কোথায় কি একটু খুঁৎ ক'রেছেন, শনি ঠাকুর ত' সেই ছিদ্র পেয়েই তাঁ'র শরীরে প্রবেশ ক'র্লেন।

শনির দৃষ্টি পড়্বামাত্রই শ্রীবৎসের নানারকম অনিষ্ট, বিঘ্ন-বিপদ্ আরম্ভ হ'লো। রাজ্য মধ্যেও নানারূপ অশান্তি, জ্বরাব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বিপদ্, অকালমৃত্যু প্রভৃতি নানা অমঙ্গল দেখা দিল! তাঁ'র নিজের ও প্রজাগণের দুর্দ্দশার

একশেষ হ'তে লাগ্‌লো। তিনি প্রজাগণের এইরূপ অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব দুঃখ-যন্ত্রণা আর চোখে দেখ্‌তে পা'র্‌লেন না! মনে মনে স্থির ক'র্‌লেন, "আমার উপর শনির দৃষ্টি পতিত হ'য়েছে ব'লে, বোধ হয় প্রজাগণের এরকম দুঃখ কষ্ট। আমি রাজ্যত্যাগ ক'রে গেলে প্রজাগণকে আর এত নিগ্রহ ভোগ ক'র্‌তে হ'বে না। অতএব, আমার রাজ্য পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত।" এইরূপ চিন্তা ক'রে তিনি রাজ্য ছেড়ে স্থানান্তরে যেতে মনস্থ ক'র্‌লেন।

এইরূপ স্থির ক'রে একদিন তিনি রাজমহিষী চিন্তাকে সঙ্গে নিয়ে এবং একটী বিছানার মধ্যে কিছু ধনরত্ন নিয়ে রাজ্যত্যাগ ক'রে চ'ল্‌লেন। রাজ্য অতিক্রম ক'রে কিছুদূর গেছেন, এমন সময় সম্মুখে একটী নদী দেখ্‌তে পেলেন। নদীতে তখন জোয়ার হ'য়েছে—একটানা স্রোত—তুফানও হ'চ্ছে—দেখে, রাজা ও রাণী চিন্তিত হ'য়ে প'ড়্‌লেন। নদীর কিনারায় গিয়ে দেখেন, অদূরে একটী লোক একখানি ছোট্ট জালি বোট নিয়ে ব'সে আছে। তখন উভয়ে মাঝির কাছে গিয়ে ব'ল্‌লেন, "মাঝি! আমাদের নদী পার ক'রে দিতে পার?" মাঝি ব'ল্‌লে,

"আমার এই নৌকাখানি একে খুব ছোট, তার উপর অত্যন্ত জীর্ণ—ইহাতে একসঙ্গে দু'জনের বেশী পার করা যাবে না—তা' হ'লে ডুবে যাবে। আপনাদের দু'জনকে পার ক'রে দিতে পারি বটে, কিন্তু অত বড় পুঁটলিটা এক সঙ্গে নিতে পারব না। বরং এক কাজ করুন; পুঁটলিটী এপারেই থাক্। আপনাদিগে আগে পার ক'রে দি'—পরে ওটী নিয়ে যাবো।" শ্রীবৎস ভাব্‌লেন, পুঁটলিটী প'ড়ে থাক্‌বে! যদি কেউ নিয়ে যায়, তা হ'লে তো মুস্কিলে পড়্‌তে হ'বে। তখন তিনি মাঝিকে ব'ল্‌লেন "তুমি আগে এই বিছানাটী ওপারে রেখে এসো, পরে আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে।" শ্রীবৎসের মুখে এই কথা শুনে মাঝি যারপর নাই খুসী হ'লো। এ মাঝিটী আর কেউ নয়—স্বয়ং শনিরাজ! শ্রীবৎসকে ধনরত্নগুলি হ'তে বঞ্চিত কর্‌বার জন্যই তিনি শুক্‌নো খট্‌খটে মাঠের মাঝখানে এক মায়া নদী সৃষ্টি ক'রে, নিজে মাঝি সেজে ব'সে আছেন!

শ্রীবৎসের ইচ্ছামত শনি বিছানাটী নৌকার ওপর চাপিয়ে কিছুদূর গেছেন, এমন সময় এক ভয়ানক ঝড় উঠ্‌লো! সেই ঝড়ের বেগে নৌকা যে কোথায় ভেসে

গেল, দেখা গেল না। নিমেষ মধ্যে ঝড়ও থেমে গেল —আর নদীও শুকিয়ে গেল—সেই খরস্রোতা নদী মুহূর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হ'লো! শ্রীবৎস ও চিন্তা এই সকল ব্যাপার দেখে' অবাক্ হ'য়ে গেলেন— তখন ভাব্‌লেন, এ কেবল শনির খেলা! মনে দারুণ উদ্বেগ, ভীষণ চিন্তা! কি ক'র্‌বেন, কোথায় যাবেন, ভেবে আকুল হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

এইরূপে নিঃসম্বল হ'য়ে, শ্রীবৎস ও চিন্তা বনের পথ ধ'রে যেতে লাগ্‌লেন। কোথায় যাচ্ছেন, কিছুই জানেন না। রাত্রি হ'লো—বিজন বন—নিকটে কোন লোকালয় নেই। অগত্যা গাছতলায় রাত্রি যাপন করাই স্থির হ'লো। ঘুম আর কারো হ'লো না। সারা রাতটাই ভয়ে ভয়ে কাট্‌লো। পর দিন অতি প্রত্যূষেই আবার চ'ল্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুদূর যাবার পরে কাছে এক নদী দেখ্‌তে পেলেন। সেই নদীতে স্নান ও পূজাদি সমাপন ক'রে, সামান্য বনফল আহার ক'র্‌লেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, আবার যেতে লাগ্‌লেন—আবার রাত হ'লো। গাছতলাতেই রাত কাটালেন। বনের স্বাদহীন যৎসামান্য ফলমূল

ভক্ষণ আর গাছতলায় রাত্রি যাপন—এই ভাবে অতি কষ্টে তাঁদের কয়েক দিন যায়। রাজা রাণী—যাঁ'দের ধন দৌলত ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, গগনস্পর্শী মর্ম্মর বিনির্ম্মিত সৌধরাজি যাঁ'দের আবাসগৃহ, হেমময় পালঙ্কে বিবিধ রত্ন-ভূষিত সুকোমল শয্যায় যাঁ'দের শয়ন, দেবভোগ্য বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য যাঁ'দের নিত্য আহার্য্য, বহুমূল্য মণি-মাণিক্য বিভূষিত বস্ত্রাদি যাঁ'দের পরিধেয়, আজ তাঁ'দের বন্য জীব জন্তুর সঙ্গে বাস, বনজাত ফলমূল আহার, একবস্ত্র পরিধান, গাছের তলায় শয়ন ও বৃক্ষমূল তাঁ'দের বালিশ! কষ্টের আর সীমা পরিসীমা নেই। খাদ্য ত বনের ফলমূল—তা-ও পেট ভ'রে নয়। খাদ্যাভাবে শ্রীবৎস ও চিন্তা দু'জনেই দিন দিন কৃশ ও কঙ্কালসার হ'য়ে প'ড়্লেন।

একদিন শ্রীবৎস দেখ্লেন, কয়েকজন ধীবর কতকগুলি মাছ নিয়ে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে। তিনি ক্ষুধায় এরূপ কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে, জালিকদের নিকট একটী মাছ চাইলেন। তা'রা আগ্রহ ক'রে একটী বড় মাছ দিল। মহারাজ মাছটী নিয়ে এসে রাজমহিষীর হাতে দিয়ে ব'ল্লেন, "মহিষি! তুমি মাছটী শীঘ্র রেঁধে

দাও, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছি!" মহারাজের কাতরতা দেখে, চিন্তার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো—চ'খের জলে গাল ভেসে গেল! কিন্তু কি দিয়ে মাছ রাঁধ্‌বেন,—কোথায় তেল নুন, আর কোথায় বা ঝাল-মসলা!—এইরূপ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হ'য়ে প'ড়্‌লেন, আর চোখের জলে ভেসে যেতে লাগ্‌লেন। মহারাজ মহিষীর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে ব'ল্‌লেন, "মহিষি, তুমি ভাব্‌ছ কেন? মাছটী পুড়িয়ে ফেল না—তা' হ'লেই তো হবে।"

রাণী এই কথা শোন্‌বামাত্র মাছটীকে বেছে একটু আগুণ ক'রে পোড়াবার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। তিনি শুনেছিলেন, পোড়া মাছ খেলে শনির দৃষ্টি কেটে যায়, তাই আগ্রহ ক'রে মাছটী পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। মাছ পোড়ান হ'লে দেখ্‌লেন, মাছের গায়ে অত্যন্ত ছাই লেগে গেছে। ছাই মাখানো মাছ কি ক'রে রাজাকে খেতে দেবেন? এই ভেবে, মাছটীকে জলে ধুয়ে আন্‌তে গেলেন। মাছ ধুচ্ছেন, এমন সময়ে—এমনি শনির চক্র যে—সেই পোড়া মাছই বেঁচে উঠে, জলে পালিয়ে গেল!—দেখে, চিন্তা ব্যাকুল ভাবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

পুণ্য-কাহিনী ১০২ পৃষ্ঠা

পোড়া মাছ জলে পলায়ন করিল।

ভেমা প্রেস, কলিকাতা

রাজার কাছে এসে সকল ঘটনা ব'ল্লেন। শুনে, রাজা প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন এবং ভাব্লেন শনির দৃষ্টি তাঁদের উপর পূর্ণ মাত্রায় প'ড়েছে।

এইরূপ অতি কষ্টে তাঁদের দিন যায়। তারপর তাঁ'রা বন ছেড়ে' লোকালয়ে যাওয়া স্থির ক'র্লেন। কিছুদূর যাবার পর তাঁ'রা এক পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। এই পল্লীতে কাঠুরিয়াগণ বাস ক'র্ত। কাঠুরিয়ারা বড় ভাল লোক দেখে, শ্রীবৎস ও চিন্তা সেই পল্লীতেই বাস করা স্থির ক'র্লেন। তা'রা নানা প্রকারে তাঁ'দের সাহায্য করে—শ্রীবৎসকে সঙ্গে নিয়ে কাট কাট্তে যায়—তিনি সেই কাট বাজারে বিক্রী ক'রে যা' কিছু পান, তা'তেই তাঁ'দের দু'জনের এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে চলে। কাঠুরিয়া রমণীরা চিন্তার সৌন্দর্য্যে ও সৌজন্যে, সরলতা ও মধুরালাপে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিছ্ল—অবকাশ পেলেই তা'রা তাঁ'র কাছেই থাক্তো ও তাঁ'র মুখে ধর্ম্ম-কথা শুনে, পরম আনন্দ লাভ ক'র্তো।

শ্রীবৎস-চিন্তার এই সুখটুকুও শনির সহ্য হ'লো না। তিনি শ্রীবৎসের নিকট থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন

কর্‌বার জন্য মতলব আঁট্‌তে লাগ্‌লেন। নিকটেই একটী নদী ছিল। এই নদীর উপর দিয়ে বড় বড় নৌকা জাহাজ যায়। একদিন এক সদাগর নৌকা বোঝাই মাল-পত্র নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য কর্‌বার জন্য যাচ্ছে। কোন কারণবশতঃ নৌকাখানি ঘাটে থাম্‌লো। থাম্‌লো বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে সেখানে এমন চড়া প'ড়ে গেল যে, কিছুতেই আর নৌকা জলে নামে না। সদাগর অনেক চেষ্টা ক'র্‌ল—কিন্তু কোন ফলই হ'লো না—নৌকা কোন ক্রমেই জলে নামান গেল না।—এও শনির খেলা! নৌকা নামাতে না পেরে সদাগর একেবারে হতাশ হ'য়ে প'ড়্‌লো। তখন শনি গণককারের বেশ ধ'রে সদাগরের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন। সদাগর সেই গণককারবেশী শনিকে ব'ল্‌লেন, "ঠাকুর! আমার নৌকাখানি যাতে ভাসে, তা'র একটা উপায় ক'রে দিন।" এই কথা শুনে শনি ব'ল্‌লেন, "এই ঘাটের নিকটেই কাঠুরিয়ারা বাস করে। সেখানে চিন্তা নামে একজন পতিব্রতা পুণ্যবতী রমণী আছেন। সেই সাধ্বী রমণী যদি তোমার নৌকা স্পর্শ করেন, তা' হ'লেই নৌকা

ভাস্‌বে—যে কোন উপায়ে হ'ক তাঁ'কে আন্‌বার চেষ্টা কর।"

গ্রহাচার্য্যের মুখে এই কথা শুনে, সদাগর দ্রুত পদে কাঠুরিয়া পল্লীতে উপস্থিত হ'লো এবং অতি বিনয়নম্র-বাক্যে গণককারের কথা নিবেদন ক'র্‌লো। অপরিচিত লোক,—কি জানি মনে যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে —তার উপর বাড়ীতে পুরুষরা কেউই নেই—তাদের সম্মতি না নিয়ে, কি ক'রে যাওয়া যেতে পারে—এইরূপ চিন্তা ক'রে কেউই তা'র প্রস্তাবে সম্মত হ'লো না। তা'দের অমত দেখে সদাগর কেঁদে ঝর্ ঝর্ ক'রে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লো। আহা রমণী-হৃদয়! সদাগরের কাতরতা—তা'র চোখের জল—দেখে তাদের প্রাণ একেবারে গ'লে গেল। তখন সকলে গিয়ে চিন্তাকে অনুরোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। চিন্তা প্রথমে সম্মত হ'লেন না বটে, কিন্তু সদাগরের করুণ ক্রন্দন দেখে, তিনি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না, তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় একেবারে বিগলিত হ'য়ে গেল! অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তিনি ঘাটে গেলেন। কৌতূহলী কাঠুরিয়া রমণীগণ কৌতুক কর্‌বার জন্য একযোগে নৌকা

নামাবার চেষ্টা ক'র্‌লো—কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বৃথা হ'লো। তখন সকলের অনুরোধে চিন্তা অঙ্গুলি স্পর্শ কর্‌বামাত্র নৌকাখানি জলে ভেসে গেল! চিন্তার অদ্ভুত শক্তি—অদ্ভুত সতীত্বের পরিচয় পেয়ে, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে গেল এবং তাঁকে ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লো। সদাগরের আর আনন্দের সীমা রইল না। চিন্তার প্রতি তা'র প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাল।

সদাগরের নৌকা জলে নামিয়ে দিয়ে, চিন্তাদেবী কাঠুরিয়া রমণীদের সঙ্গে ঘরে ফির্‌বেন—এমন সময়ে শনির কুহকে সদাগরের মাথায় দুষ্টু সরস্বতী চাপ্‌লো। হঠাৎ সদাগরের খেয়াল হ'লো, "যদি আবার কোথাও নৌকা আট্‌কে যায়, তখন আবার এমন সতী সাধ্বী আর কোথা পাবো? বরং এঁকে সঙ্গে লওয়া যাক্।" এইরূপ স্থির ক'রে দুরাশয় সদাগর জোর ক'রে চিন্তা দেবীকে নৌকার উপরে তুলে নিলে। চিন্তা দেবী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, সদাগরকে কত অনুনয় বিনয় ক'র্‌লেন। কিন্তু সদাগর কি আর সে সদাগর আছে? শনির কুহকে সেও সাক্ষাৎ শনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে তাঁ'র কোন

কথাই শুন্‌লো না। শ্রীবৎস বা এমন কোন একটী লোক বাড়ীতে নেই, যে তাঁ'র সাহায্য করে। কাঠুরিয়া রমণীগণ তীরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। সদাগর বিনা বাধায় চিন্তাকে নিয়ে দ্রুত বেগে নৌকা বেয়ে প্রস্থান ক'র্‌লো।

চিন্তা দেখ্‌লেন, তাঁর উদ্ধারের ত কোন উপায়ই নেই, হয় ত এ জীবনে আর স্বামীকে দেখ্‌তে পাবেন না, দুর্বৃত্ত সদাগর তাঁ'র রূপলাবণ্য দেখে, কি জানি, যদি সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে, এইরূপ দারুণ চিন্তায় তিনি আকুল হ'য়ে প'ড়লেন এবং সূর্য্যের দিকে চেয়ে কাতর ভাবে প্রার্থনা ক'র্‌লেন "হে সূর্য্যদেব! হে দেব-দিবাকর! হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়! তুমিই দয়া ক'রে আমার এই সৌন্দর্য্য দিয়েছ। এখন এই সৌন্দর্য্যই আমার পরম শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দয়াময়! এই অসহায়া কন্যার প্রতি সদয় হ'য়ে আমার সুরূপ বিদূরিত ক'রে, ধরাতলে যা কিছু কুৎসিৎ, আমাকে দাও—আমার গায়ে গলিত কুষ্ঠ দাও—পচা গন্ধে যেন কেউ আমার অঙ্গস্পর্শ না করে—আমার নিকটে আস্‌তেও ঘৃণা বোধ করে। তোমার

দেওয়া সৌন্দর্য্যই আজ সতী নারীর সর্ব্বনাশের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবলা রমণী কি রূপলাবণ্যের দায়ে এরূপ ভাবে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত হ'বে?" মনে মনে লক্ষ্মীকে জানালেন, "মা, সতী-শিরোমণি! বড় বিষম দায়ে প'ড়েছি মা! তুমি দয়া ক'রে আমায় এককালে রাজমহিষী ক'রেছিলে—তোমার ইচ্ছায় আমি পরম পুণ্যবান্ স্বামী পেয়ে সকল সুখের অধিকারী হ'য়েছিলাম। এখন ত সকল সুখেই বঞ্চিত ক'রেছো মা!—তাতেও আমি তত দুঃখিত নই। আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না। মা! তুমি ত জান, সতীত্বই নারীর একমাত্র সৌন্দর্য্য, একমাত্র রত্ন-ভূষণ। মা, তুমি আমার সহায় হও—আমার সতীত্ব যেন রক্ষা হয়।"

সতীর এই প্রকার মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তি শুনে, দেবগণ বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না ক'রে, তাঁ'কে রক্ষা কর্‌বার জন্য তৎপর হ'লেন। নিমেষ মধ্যে চিন্তার সে অপরূপ রূপলাবণ্য অন্তর্হিত হ'য়ে গেল—তাঁ'র গায়ে গলিত-কুষ্ঠ দেখা দিল—অল্পদিন মধ্যে সর্ব্ব শরীর প'চে গেল—পচা ঘা থেকে পোকা

ও পূঁজ রক্ত প'ড়্তে লাগ্‌লো—ভয়ানক দুর্গন্ধ ছাড়্তে লাগ্‌লো। তিনি নৌকার একপাশে প'ড়ে রইলেন—কেউ সেদিকে ফিরেও তাকায় না। চিন্তা দিবস যামিনী পতির চরণ যুগল চিন্তা করেন এবং স্বামী যেন সুস্থ শরীরে থাকেন, তাঁ'র কোন বিপদ্‌ না হয়, তাঁকে যেন পুনরায় দেখ্‌তে পান, এক মনে ভগবানের কাছে এই মিনতি জানান।

শ্রীবৎস ঘরে ফিরে এসে, কাঠুরিয়া রমণীদের মুখে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে, মাথায় করাঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর মাথায় যেন বজ্রপাত হ'লো—তিনি একেবারে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে, সদাগরের অনুসন্ধানে বাহির হ'লেন এবং সেই নদীর ধার দিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। যেখানেই যান, যার সঙ্গেই দেখা হয়, সকলকেই সদাগরের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কারো কাছেই কোন খবরই পেলেন না।

এইরূপে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তিনি একদিন চিত্তানন্দ নামে এক বনে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেই বনে সুরভি নামে এক আশ্চর্য্য গাভী থাকৃতো। এই

সুরভির দুধের এম্‌নি গুণ যে, যেখানে সেই দুধ পড়ে, সেখানেই সোণা হ'য়ে যায়। শ্রীবৎস সুরভির নিকট কিছুদিন থাক্‌লেন এবং সোণার তালগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে একত্র ক'র্‌লেন।

একদিন তিনি নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন, এক বণিক্ নৌকায় চেপে বাণিজ্য ক'র্‌তে যাচ্ছে। বণিক্‌কে দেখে, তাঁ'রও বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য কর্‌বার ইচ্ছা হ'লো। তখন তিনি বণিক্‌কে ব'ল্‌লেন, "তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য কর, তা' হ'লে আমি বিশেষ উপকৃত হই।" বণিক্ প্রথমে তাঁ'র প্রস্তাবে সম্মত হ'লো না। কিন্তু তাঁ'র মুখে সোণার স্তূপের কথা শুনে, লোভের বশীভূত হ'য়ে তাঁ'কে নৌকায় নিতে সম্মত হ'লো এবং লোকজন পাঠিয়ে সেই স্তূপাকার সোণা নৌকায় নিয়ে এলো। এই যে সদাগর, এ আর কেউ নয়—সেই সে কৃতঘ্ন, মহাপাপী, যে জোর ক'রে চিন্তাদেবীকে নৌকায় তুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে।

শ্রীবৎস দু' চারদিন নৌকায় চেপে যাচ্ছেন। কুচক্রী

শনির মায়ায় পাপাশয় সদাগরের মনে সোণার লোভ এত প্রবল হ'য়ে উঠলো যে, শ্রীবৎসকে মেরে ফেল্‌বার উদ্দেশ্যে তাঁ'র সহিত অনর্থক কলহের সৃষ্টি ক'রে তাঁ'কে ঠেলে জলে ফেল দিল! চিন্তা শ্রীবৎসের গলার আওয়াজ শুনে তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিলেন। চকিতের ন্যায় তাঁকে দেখে, পরম আনন্দ লাভ ক'র্‌লেন, প্রাণে বড়ই আশা হ'লো। কিন্তু শনির চক্রে তাঁ'র সকল আশা, সকল আনন্দ একেবারে লীন হ'য়ে গেল! মহারাজকে জলে পতিত হ'তে দেখে, তিনি তাঁ'র মাথার বালিশটী জলে ফেলে দিলেন—আশা, যদি এই বালিশটী অবলম্বন ক'রে, কোন গতিকে সাঁতার দিয়ে কূলে উঠ্‌তে পারেন। স্বামীর এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা দেখে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন, দুঃখে তাঁ'র প্রাণ ফেটে যেতে লাগ্‌লো। অথচ বণিকের ভয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে পারেন না। কেবল কাতর ভাবে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন—যেন স্বামীর জীবন রক্ষা হয়।

মহারাজ শ্রীবৎস কয়েক দিন জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এক নূতন দেশে এসে তীর পেলেন।

এই দেশের নাম সৌতিরাজ্য। এই রাজ্যে রম্ভাবতী নামে এক মালিনী বাস ক'রত। মালিনীর একটী সুন্দর ফুলের বাগান ছিল। শ্রীবৎস এই বাগানের কাছে এসে তীরে উঠ্‌লেন এবং অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় এক গাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে ব'সে রইলেন। শরীরে তাঁ'র একটুও বল নেই—হাত পা অবশ হ'য়ে প'ড়েছে—একেবারে উত্থান-শক্তি-রহিত হ'য়ে প'ড়েছেন।

শ্রীবৎস বাগানে প্রবেশ কর্‌বামাত্র বাগানটী এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ ক'রল! গাছপালা সকল বসন্ত কালের মত ফলে ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠ্‌ল—আধমরা গাছগুলিতে কচি কচি পাতা গজালো—ফুল্ ও ফল ধ'র্‌ল—সুখস্পর্শ মলয়ানিল প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌লো—কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ পাখীরা সুমধুর তানে চারদিক্ মুখরিত ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—সুগন্ধ ফুলের সৌরভ পেয়ে মৌ-মাছি ও অলিকুল আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, ছুটে এসে গুন্ গুন্ শব্দে চারদিক্ আমোদিত ক'রে তুল্‌লো।

মালিনী তখন বাড়ীতে ছিল না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে

এসে প্রকৃতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন—বাগানের এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল! কিন্তু কারণ কিছুই বুঝ্তে পার্লে না। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখ্ছে—এমন সময় দেবতার ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট এক অতি সুপুরুষ একটী গাছের তলায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অচৈতন্যবৎ ব'সে আছেন, দেখ্তে পেলে। মালিনী তাঁ'র অলৌকিক সুন্দর মূর্ত্তিখানি দেখে, একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! দ্রুত-পদে তাঁ'র কাছে এগিয়ে গিয়ে, আর তাঁ'র এই রকম অবস্থা দেখে,—তিনি কে, কোথা থেকে, কিরূপে এখানে এসেছেন, কি জন্য তাঁ'র এরূপ অবস্থা ইত্যাদি সকল কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে। মহারাজা শ্রীবৎস আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বর্ণন ক'র্লেন। রম্ভা তাঁ'র প্রতি সবিশেষ সম্ভ্রম দেখিয়ে, তাঁ'কে সঙ্গে ক'রে তা'র বাড়ীতে নিয়ে এলো। মালিনীর অকৃত্রিম সেবা শুশ্রূষায় মহারাজা শ্রীবৎস প্রকৃতিস্থ হ'লেন এবং মালিনীর আগ্রহ দেখে, সেখানে কিছুদিন অবস্থিতি করাই স্থির ক'র্লেন।

এই সৌতিরাজ্যে বাহুদেব নামে একজন রাজা

ছিলেন। রাজা বাহুদেবের ভদ্রা নামে অসামান্য-রূপবতী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না এক কন্যা ছিলেন। বাল্যকালাবধি তিনি দেবতা ব্রাহ্মণে বড় ভক্তিমতী ছিলেন, হর-গৌরীর পূজা না ক'রে কোন দিন জল-গ্রহণ ক'র্‌তেন না। ভদ্রা মহারাজা শ্রীবৎসের সৎগুণাবলীর পরিচয় পেয়ে অবধি তাঁ'তেই মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন এবং প্রত্যহ পূজার সময় প্রার্থনা করেন, "হে দেবাদিদেব, মহাদেব! হে মা হরমনোরমা! আমি যেন মহারাজা শ্রীবৎসকে পতিরূপে পাই।"

ভদ্রা বিবাহ-যোগ্যা হ'লে, রাজা বাহুদেব এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন কর্‌লেন। নানা দিগ্‌দেশ থেকে রাজা ও রাজপুত্রগণ একে একে সৌতিরাজ্যে আস্‌তে লাগ্‌লেন। রাজকন্যার স্বয়ম্বরের কথা শুনে, শ্রীবৎস স্বয়ম্বরের ধূমধাম দেখ্‌বার জন্য সভার নিকটে এক কদম গাছের তলায় গিয়ে ব'সে রইলেন।

আজ ভদ্রার স্বয়ম্বর। রাজ-রাজড়ারা নানাবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে সভামণ্ডপে ব'সে আছেন। ভদ্রা স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ ক'রেই উর্দ্ধ-নেত্রে ভগবান্‌কে জানালেন, "হে বাঞ্ছাকল্পতরু নারায়ণ!

আমি যেন মনোমত স্বামী পাই।” পরক্ষণেই আকাশবাণী হ'লো, “তুমি যাঁ'কে স্বামীরূপে পাবার জন্য এতদিন কামনা ক'রে আস্‌ছ, তোমার সেই চির-বাঞ্ছিত স্বামী কদম গাছের তলায় ব'সে আছেন।” এই আকাশবাণী শোন্‌বামাত্র তিনি নিকটবর্ত্তী কদম-গাছের দিকে অগ্রসর হ'লেন—রাজাদের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে, ছদ্মবেশী শ্রীবৎসের গলায় মালা দিলেন। শ্রীবৎসের রূপ দেখে ভদ্রা একেবারে বিমোহিত হ'য়ে গেলেন—মনোমত স্বামী পেয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান ক'র্‌লেন। অজানা, অচেনা, কোথাকার কে, একজন পথের ভিখারীর গলায় মালা দেওয়ায় রাজারা ছি, ছি, ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা বাহুদেবও মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও কন্যার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'লেন—এবং কন্যা-জামাতার থাকবার জন্য বা'র্ বাটীতে স্থান নির্দ্দেশ ক'র্‌লেন। ইনি যে অযোধ্যার মহারাজা শ্রীবৎস, বাহুদেব তা' ঘুণাক্ষরেও জান্‌তেন না।

শ্রীবৎস বাহুদেবের এরূপ ব্যবহারে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'লেন না। কারণ তিনি জান্‌তেন শনির দৃষ্টি তাঁ'র উপর পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিছুদিন সৌতি রাজ্যে বাস

করবার পর, তিনি বাহুদেবের নিকট প্রার্থনা ক'র্‌লেন, "নদীর উপর দিয়ে যে সকল বাণিজ্য-তরী যায়, ঐ সকলের কর আদায়ের ভার আমাকে দিন।" বাহুদেব জামাতার প্রার্থনা মত তাঁ'কে বাণিজ্য-তরীর কর আদায়ের ভার দিলেন।

শ্রীবৎস লোকজন সঙ্গে নিয়ে নদীর কূলে অবস্থিতি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন এবং বাণিজ্য-তরী দেখ্‌লেই তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেন। এইরূপে অনেক দিন কেটে গেল। যে উদ্দেশ্যে তাঁ'র এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া, তা'র কিছুই সন্ধান হ'লো না, দেখে তিনি ভাবনায় অবসন্ন হ'য়ে প'ড়্‌লেন। অবশেষে একদিন সেই পাপাশয় সদাগরের বাণিজ্য-তরী ঘাটে এসে লাগ্‌লো। শ্রীবৎস স্বয়ং নৌকাখানি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌লেন। দেখ্‌লেন, এক পার্শ্বে চিন্তা অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় প'ড়ে আছেন। কা'কেও কোন কথা না ব'লে নৌকা থেকে যাবতীয় দ্রব্য উপরে তুল্‌তে আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র অনুচরগণ নৌকার যা' কিছু জিনিষ বাইরে আন্‌লে।

সদাগর বাহুদেবের নিকট তা'র প্রতি অত্যাচারের

বিষয় নিবেদন ক'র্লে। বাহুদেব জামাতার এই প্রকার অন্যায় আচরণের কথা শুনে খুব রেগে গেলেন এবং তাঁ'কে ডেকে পাঠালেন। শ্রীবৎস তখন শ্বশুরের নিকট গিয়ে, দুষ্ট সদাগর তাঁ'র স্ত্রীর উপর, পরিশেষে তাঁ'র উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছে, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন ক'র্লেন।

রাজা বাহুদেব জামাতার পরিচয় পেয়ে, তাঁ'র উপর যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন এবং সদাগরের যৎপরোনাস্তি দণ্ডবিধান ক'র্লেন। অন্তঃপুরে এই খবর পাঠান হ'লো। রাজমহিষী, ভদ্রা প্রভৃতি অন্তঃপুর-বাসিনীরা নদীতীর পর্য্যন্ত গিয়ে চিন্তা দেবীকে সমুচিত সম্মানের সহিত রাজবাটীতে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন।

বহুদিন পরে স্বামীকে দেখে চিন্তা যেন মৃত-দেহে প্রাণ পেলেন। তাঁ'র চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে আনন্দাশ্রু প'ড়্তে লাগ্‌লো, আনন্দে তাঁ'র কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। প্রথম প্রথম কোন কথাই ব'ল্তে পার্লেন না--কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্তে লাগ্‌লেন। তারপর সাতবার স্বামীকে প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'র্লেন।

রাজমহিষী, ভদ্রা ও অন্যান্য পুরনারীগণ চিন্তাকে

বরণ ক'রে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁ'র যথাযোগ্য আদর যত্ন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সূর্য্যদেবের ইচ্ছায় তিনি ব্যাধি-মুক্ত হ'লেন এবং তাঁ'র পূর্ব্বের মত রূপলাবণ্য ফিরে পেলেন। তাঁ'র সেই অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখে সকলেই চমৎকৃত হ'লেন এবং রাজ্যের সকল নরনারীই তাঁ'র সতীত্বের কথা শুনে, সহস্র মুখে ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

এই সময়ে শনিরাজ বাহুদেবের রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে, শ্রীবৎস ও চিন্তাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত ক'রেছেন ব'লে, অনুতাপ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন এবং তাঁ'দের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। শনিরাজ মুক্তকণ্ঠে চিন্তার পতিপরায়ণতার প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। বা'র বছরের পর, আজ শ্রীবৎস ও চিন্তা শনির দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেলেন। সৌতিরাজ্যে কিছু দিন থাক্‌বার পর, শ্রীবৎস—চিন্তা ও ভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে, মহাসমারোহে অযোধ্যায় ফিরে এলেন এবং পরম সুখে কালাতিপাত ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। অযোধ্যার ঘরে ঘরে সতীসাধ্বী চিন্তার গুণকীর্ত্তন হ'তে লাগ্‌লো।

দময়ন্তী।

র্ব্বকালে বিদর্ভ নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল ভীমসেন। সেখানে দমন নামে একজন প্রভাবশালী সন্ন্যাসী ছিলেন। রাজা ভীমসেনের সন্তানাদি ছিল না। সন্ন্যাসীর বরে ভীমসেনের একটী পরমাসুন্দরী কন্যা হ'ল। দমনের বরে কন্যাটীকে লাভ ক'রেছিলেন ব'লে, তাঁ'র নামানুসারেই মেয়েটীর নাম রাখ্‌লেন দময়ন্তী।

দময়ন্তীর মত অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মেয়ে সেকালে আর ছিল না। তাঁ'র ঈদৃশ সৌন্দর্য্য দেখে দেবতা গন্ধর্ব্বেরাও লজ্জিত হ'তো। রাজা ও রাণী অতি যত্নে কন্যার লালন পালন করেন। রাজমহিষী এক মুহূর্ত্তের জন্যও মেয়েকে ঝি-চাকরদের কাছে যেতে দেন

না—সকল সময়ই চোখে চোখে রাখেন, অতি সন্তর্পণে কন্যার লালন পালন করেন।

দময়ন্তী শুক্লপক্ষের শশীকলার মত দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র রূপলাবণ্য ফুটে বেরুতে লাগ্‌লো।

দিন দিন যেমন বড় হ'তে লাগ্‌লেন, রাণী তাঁ'র লেখাপড়া ও নানারকম শিল্প ও কলা-বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। সকাল হ'লেই তাঁকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেন এবং দেবদেবীর স্তোত্র-পাঠ শেখান। মুখ হাত ধোওয়া হ'য়ে গেলে, ভাল ভাল নীতিগর্ভ বই পড়ান, মাঝে মাঝে গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম শেখান। সন্ধ্যার পরে নিজের কাছে বসিয়ে সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতি আদর্শ রমণীদের গল্প বলেন—তাঁ'রা কত দুঃখ কষ্টে প'ড়ে কিরূপ ভাবে সতীত্ব রক্ষা ক'রেছেন—তাঁদের কিরূপ পতিভক্তি ছিল—সতীত্বই রমণীর শ্রেষ্ঠ রত্ন—সতীনারীর প্রভাবের কাছে দেবতাদিগেও ভয় ক'র্‌তে হয়—সতী নারী পরকালে স্বর্গে গমন করে—এইরূপ ভাবে মেয়েকে শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন। দময়ন্তী এই সকল কাহিনী অতি আগ্রহ ক'রে শুন্‌তেন এবং

তাঁদের দুঃখ যাতনার কথা শুনে এমন বিভোর হ'য়ে যেতেন,—প্রাণে এরূপ ব্যথা পেতেন যে, আবেগভরে মাঝে মাঝে কেঁদে ফেল্‌তেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তেন, "হে ভগবান্! আমি যেন স্বামী-সোহাগিনী হই—সুখে দুঃখে আমি যেন স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে থাকি। দয়াময়! তুমি দয়া ক'রে আমার সহায় হ'য়ো, আমি যেন সকল অবস্থাতেই এই সকল সতী রমণীদের মত সতীত্ব রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে পারি।"

দময়ন্তী ক্রমে যৌবনে পদার্পণ ক'র্‌লেন। পূর্ণিমার চাঁদের মত তাঁ'র রূপলাবণ্য ষোল কলায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌লে মনে হয়, যেন মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা খানি! রাজার মেয়ে—বাপ মা'র বড় আদরের জিনিষ—ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত, তা'র উপর এতো রূপ—কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁ'র মনে গর্ব্বের লেশমাত্র স্থান পায় না—পূর্ণিমার চাঁদের মত তাঁ'র আকৃতি, প্রকৃতি ও আচরণ নির্ম্মল ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীলতা ও ধীরতা তাঁ'র সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তুল্‌লে। এখন থেকে তিনি নানা রকম ধর্ম্মকর্ম্ম,

বারব্রত, পিতামাতার সেবাযত্ন, সাংসারিক কাজকর্ম্ম, যাচক অতিথি অভ্যাগতের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, দাস দাসীদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ ক'র্‌লেন। আবার অবকাশ পেলেই সখীদের সঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদে কাল কাটান। এক কথায় লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় রূপ ও গুণ তাঁতে একাধারে বিদ্যমান। তাঁ'র রূপ গুণের কথা অল্প দিন মধ্যেই দেশ বিদেশে ছড়িয়ে প'ড়্‌লো।

এই সময়ে নিষদ রাজ্যে নল নামে একজন রাজা ছিলেন। মহারাজ নল যেমন ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ, তেমনি সুপুরুষ। তৎকালে তাঁ'র মত রূপবান্ পুরুষ আর ছিল না। দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা তাঁ'র কর্ণগোচর হ'লো। তাঁ'র বয়স্যগণ উঠ্‌তে ব'স্‌তে দময়ন্তীর সৌন্দর্য্যের কথাই ব'লত। তা' ছাড়া যে কেউ দময়ন্তীকে দেখেছে, সেই দময়ন্তীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, আর বলে নলরাজই দময়ন্তীর যোগ্য পাত্র। বাস্তবিক কথাও তাই। নলরাজ যেমন কন্দর্পের মত রূপবান্, দময়ন্তীও সেইরূপ রতীর ন্যায় রূপবতী। মহারাজ নল সকলের মুখেই দময়ন্তীর এতাদৃশ রূপ-

গুণের পরিচয় পেয়ে, তাঁ'র প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়্লেন।

এদিকে দময়ন্তীও সখীগণের মুখে—নলরাজের দেবোপম দিব্যকান্তি ও ধর্ম্মশীলতার কথা এবং নলরাজই তাঁ'র স্বামী হ'বার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র—শুনে, মনে মনে তাঁ'র প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়্লেন।

প্রতিদিনই সখীদের সঙ্গে প্রমোদ-উদ্যানে যান বটে, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকে দময়ন্তীর তাদৃশ আগ্রহ দেখা যেতো না—সঙ্গিনীগণ খেলা করে, আর তিনি কিছু দূরে স'রে গিয়ে নলরাজের চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে বিমনার মত একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। সহচরীগণ রাজনন্দিনীকে এই রকম উন্মনা দেখে, আজগুবি হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি ক'রে, তাঁ'র মনে আনন্দ উৎপাদনের প্রয়াস পায়। তাঁ'র মনের ভাব অবগত হবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা ক'র্তে লাগ্লো, কিন্তু কিছুতেই একটী কথাও বের ক'র্তে পার্ল না।

একদিন বিকালে দময়ন্তী সহচরীদের সঙ্গে প্রমোদ-উদ্যানে ফুল তুল্ছেন, আমোদ প্রমোদ ক'র্ছেন, এমন সময়ে দেখ্লেন, একটী অতি সুন্দর রাজহাঁস নানা

রকম অঙ্গভঙ্গি ক'রে, সরোবরে সাঁতার দিচ্ছে। রাজহাঁসটীকে ধর্‌বার জন্য তাঁ'র অত্যন্ত ইচ্ছা হ'লো। সখীগণ হুকুম পেয়েই ত জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো এবং রাজহাঁসের পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌লো। দময়ন্তী সরোবরের শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাটের উপর ব'সে কৌতুক দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

হাঁসকে ধর্‌বার জন্য যখন সকলে অনেক দূর চ'লে গেছে, এমন সময় হাঁস দ্রুতবেগে দময়ন্তীর কাছে এসে হাজির হ'লো। তাঁকে একাকিনী দেখে বল্‌লে, "রাজনন্দিনি! তুমি বোধ হয় মহারাজ নলের কথা শুনেছো। আমি পৃথিবীর নানাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন ধার্ম্মিক ও সুপুরুষ রাজা কোথাও দেখিনি। মহারাজ নলও তোমার রূপগুণের কথা শুনে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়েছেন এবং তোমাতেই মন প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ফেলেছেন। দময়ন্তীর নামই তাঁ'র ধ্যান ও জপমালা হ'য়ে প'ড়েছে। তোমার কথা ভেবে ভেবে তিনি দিন দিন কৃশ ও মলিন হ'য়ে যাচ্ছেন। তোমাকে যদি লাভ না ক'র্‌তে পারেন, বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাবেন—এমনি তাঁ'র অবস্থা হ'য়েছে। আমাকে

তিনি পাঠিয়েছেন—তোমার মনোগত অভিপ্রায় জান্‌বার জন্য। তোমাকেও যেরূপ রূপবতী দেখ্‌ছি, এমন আর দ্বিতীয় দেখি নাই—একমাত্র নলরাজই তোমার স্বামী হবার যোগ্য পাত্র—আমার ইচ্ছা তুমি নলরাজকে পতিত্বে বরণ কর।”

হাঁসের মুখে নলরাজের সৌন্দর্য্য ও সৎগুণাবলীর কথা শুনে দময়ন্তী বিশেষ আনন্দ লাভ ক’র্‌লেন। যাঁ’কে পাবার জন্য, যাঁ’র মনোভাব জান্‌বার জন্য এতদিন প্রাণ তোলাপাড়া ক’র্‌ছিল, তিনি যে সদয় হ’য়ে নিজেই সম্মতি জ্ঞাপন ক’রেছেন, শুনে, যেন হাতে চাঁদ পেলেন এবং রাজহাঁসকে ব’ল্‌লেন, “পাখী, তুমি শীঘ্রই নিষদ-রাজের কাছে যাও এবং তাঁকে ব’লো, আমি মহারাজের পরিচয় পেয়ে অবধি তাঁ’র শ্রীচরণে জীবন মন অর্পণ ক’রে রেখেছি। তিনি যেন দয়া ক’রে দাসীকে চরণে স্থান দেন।”

রাজহাঁস এই শুভ সংবাদ নিয়ে দ্রুতপদে নলরাজের নিকট উপস্থিত হ’য়ে সকল কথা নিবেদন ক’র্‌লো। যাঁ’র চিন্তায় নলরাজ সোণার দেহ কালি ক’রে ফেলেছেন, সেই দময়ন্তীও যে তাঁ’র প্রতি আকৃষ্ট, শুনে

প্রাণে বড়ই আশ্বাস পেলেন—যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়্লেন।

রাজহাঁসকে বিদায় দেবার পর থেকেই দময়ন্তীর মনের ভাব হঠাৎ এ-রকম বদ্‌লে গেল যে, সকল সময়েই অন্যমনস্ক ভাবে থাক্‌তেন—নলরাজের চিন্তাতেই তিনি নিমগ্ন হ'য়ে প'ড়্তেন। সময়ে আহার নেই, নিদ্রা নেই, মুখে আর সে হাসি নেই, এখন আর সখীসঙ্গও ভাল লাগে না, নির্জ্জনে ব'সে সেই এক চিন্তা—আর দীর্ঘনিশ্বাস! রাজমহিষী কন্যার এই রকম উদাস ভাব দেখে চিন্তিতা হ'য়ে প'ড়্লেন। নানা প্রকারে তাঁ'র মনোগত অভিপ্রায় জান্‌বার জন্য চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু কোন মতেই দময়ন্তী আত্ম-প্রকাশ ক'র্‌লেন না। কন্যার এই রকম মনের ভাব দেখে, তিনি রাজার নিকট তাঁ'র বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌লেন। রাজমহিষী বুঝ্‌লেন, এরূপ ভাব অনুরাগের পূর্ব্ব লক্ষণ। কন্যা যে কা'র প্রতি অনুরক্ত, জান্‌তে না পেরে, পিতা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন ক'র্‌লেন।

তখনকার দিনে প্রত্যেক রাজকন্যাই মনোমত

স্বামী পছন্দ ক'রে নিতে পার্‌তো। তাই স্বয়ম্বর সভা ক'রে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-রাজড়াদের নিমন্ত্রণ করা হ'তো। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা ও রাজকুমারগণ সভার মধ্যে নিরূপিত স্থানে ব'স্‌তেন। রাজকুমারী সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে পুষ্পমাল্য হাতে সভাস্থলে আস্‌তেন। তাঁ'র সঙ্গে একজন পরিচারিকাও থাক্‌তো। এই পরিচারিকা বিভিন্ন দেশের রাজাদের বংশাবলী জান্‌ত। পরিচারিকা রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক রাজার কাছে গিয়ে রাজকন্যাকে তাঁ'র গুণাবলী ও বংশমর্য্যাদা বর্ণন ক'র্‌তো। রাজকন্যা তাঁ'দের মধ্যে নিজের পছন্দমত পাত্রের গলায় মালা দিতেন।

নলরাজা ও দময়ন্তী উভয়েই গোপনে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু যদি ভীমসেন অন্য কোথাও দময়ন্তীর বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে ফেলেন, —এই চিন্তায় উভয়ের এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণে শান্তি ছিল না। কিছুদিন পরে বিদর্ভ রাজ্য থেকে দূত এসে নলরাজের নিকট দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সংবাদ নিয়ে এলো। এই খবর পেয়ে নলরাজের দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে কমে গেল।

দময়ন্তী মনোমত পতি নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পাবেন শুনে আশ্বস্ত হ'লেন। স্বয়ম্বরের দিন ধার্য্য হ'লো। দেশ বিদেশের রাজা-রাজড়াদের নিমন্ত্রণ করা হ'লো।

একদিন নলরাজ একাকী উদ্যানের মধ্যে বিচরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে দময়ন্তীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে স্বর্গ হ'তে দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নি এসে তাঁ'র সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন এবং তাঁ'কে ব'ল্লেন, "মহারাজ নল! আমরা তোমার কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তোমা দ্বারাই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হবে জেনে, এই কার্য্যের ভার তোমার উপরই অর্পণ ক'র্‌লাম। আমরা অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী দময়ন্তীকে বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছুক। দময়ন্তী আমাদের যে কোন একজনকে বরণ করে, এই আমাদের বাসনা। তুমি তা'র কাছে গিয়ে, আমাদের এই প্রস্তাব জানিয়ে, যে কোন উপায়ে হ'ক্ তাকে সম্মত ক'র্‌বে।"

দেবগণের এইরূপ গর্হিত প্রস্তাব শুনে, নলরাজ প্রাণে শেল বিদ্ধবৎ দারুণ যাতনা পেলেন; কিন্তু দেব-আজ্ঞা—অবশ্য প্রতিপাল্য। অনন্যোপায় হ'য়ে

তিনি দৌত্যকার্য্যে সম্মত হ'লেন এবং অবিলম্বে বিদর্ভ রাজ্যে চ'ল্লেন।

কা'ল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দময়ন্তী তাঁ'র সখীদের সঙ্গে বাগানে এসে, আঁচল ভ'রে নানা রকম ফুল তুলেছেন—নিজে একটী কুঞ্জবনে ব'সে মনের মত ফুলের মালা গাঁথ্‌ছেন—আর সখীরা বাগানের চারদিকে যেখানে যত রকম ভাল ভাল ফুল আছে, বেছে বেছে তুল্‌ছে—আর কা'লকের বিয়ের বাসরে কে কি রকম ঠাট্টা-তামাসা, আমোদ-কৌতুক, নাচ-গান ক'র্‌বে, তা'রই জল্পনা কল্পনা ক'চ্ছে, আর আহ্লাদে গড়িয়ে প'ড়্‌ছে।

দময়ন্তী নির্জ্জনে ব'সে মালা গাঁথ্‌ছেন, এমন সময়ে নলরাজ হঠাৎ তাঁ'র সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেন। এরূপ স্থানে এরূপ সময়ে হঠাৎ অপরিচিত পুরুষের আগমনে দময়ন্তী প্রথমে বড়ই ভয় পেলেন। পরে ব'ল্‌লেন, "মহাশয়, আপনি কে? কি অভিপ্রায়ে এরূপ স্থানে এসেছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। প্রমোদ উদ্যানে কুল-ললনাদের কাছে আসা যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ,

তা' বোধ হয় আপনি জানেন। তা' ছাড়া প্রহরিগণ দেখ্‌লে যথেষ্ট বিপদেরও আশঙ্কা আছে।"

নলরাজ এই কথা শুনে বড়ই লজ্জিত হ'লেন এবং বিনীতভাবে ব'ল্‌লেন, "রাজনন্দিনি! আমার অভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য আমায় মাপ ক'র্‌বেন। স্ত্রীজাতির উপর শিষ্টাচার আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কেবল দেব অনুরোধেই এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কাজ কর্‌তে বাধ্য হ'য়েছি। আর দেব-বরে আমি প্রচ্ছন্নভাবে এসেছি—কোন তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে দেখ্‌তে পার্বে না। দেবগণ আমাকে যে উদ্দেশ্যে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, দয়া ক'রে শুনুন। আপনার অসামান্য রূপ-গুণের কথা শুনে, দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম আপনাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা করেন; আপনি এই চা'র জনের মধ্যে যে কোন একজনকে বরণ ক'র্‌লে, তাঁ'রা সকলেই সন্তুষ্ট হ'বেন।"

এই কথা শুনে,দময়ন্তী দেবদূত নলরাজকে ব'ল্‌লেন, "পূজনীয় দেবগণকে আমার সমুচিত ভক্তি ও সম্মান জানিয়ে ব'ল্‌বেন, আমি পূর্ব্ব থেকেই মনে মনে নলরাজকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি; এখন আর অন্য

কা'কেও পতিরূপে গ্রহণ কর্‌বার অধিকার আমার নেই। দেবগণের আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য—জেনেও আমি তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার্‌লাম না—এজন্য তাঁ'রা যেন অপরাধ গ্রহণ না করেন।"

নলরাজ দময়ন্তীর রূপমাধুরী দেখে' এবং তাঁ'র সুধাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর কথা শুনে, এরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন যে, আবেগভরে একথা সেকথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আত্ম-প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেন। এতক্ষণ দময়ন্তী অপরিচিত ব্যক্তি স্থির ক'রে দূতবেশী নলরাজের প্রতি ক্ষণিকের তরে দৃষ্টিপাত ক'রেই অবনত আননে কথাবার্ত্তা কইছিলেন। নলরাজের মুখে তাঁ'র পরিচয় পেয়ে দময়ন্তীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হ'য়ে উঠ্‌ল এবং বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁ'র প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রেই তাঁ'র স্বর্গীয় রূপ দেখে এমনই বিভোর হ'য়ে গেলেন যে, আবেগভরে হাতের মালাটী নিয়ে তাঁ'র গলায় পরাবার জন্য উদ্যত হ'লেন। নলরাজ কিন্তু সেই চিরবাঞ্ছিত মালা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে বাধ্য হ'লেন এবং দময়ন্তীকে মধুরভাষে ব'ল্‌লেন, "আজ আমি দেবতাদের দৌত্যকার্য্যে

ব্রতী, এরূপ অবস্থায় বরমাল্য গ্রহণ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। দময়ন্তি! কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আমি এই দেবতা-বাঞ্ছিত উপহারও গ্রহণ ক'র্‌তে অসমর্থ। আমার এই রূঢ়, নির্ম্মম ব্যবহারে তোমার কুসুম-কোমল হৃদয়ে দারুণ বেদনা দিলাম। ভদ্রে! তুমি আমার অপরাধ মাপ ক'রো।" এই কথা ব'লে নলরাজ দময়ন্তীর নিকট বিদায় নিলেন এবং দ্রুতপদে ফিরে গিয়ে দেবগণের নিকট দময়ন্তীর অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'র্‌লেন।

আজ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। তাঁ'র দেবতা-বিনিন্দিত রূপ-লাবণ্যের পরিচয় পেয়ে, দেশ বিদেশের রাজা ও রাজকুমারগণ এ হেন রমণী-রত্ন লাভের আশায় প্রাণে অপূর্ব্ব আশা পোষণ ক'রে বিদর্ভ রাজ্যে এসেছেন। সভাগৃহ মহা জাঁকজমকে সুসজ্জিত। রাজারা বহুমূল্য বেশভূষায় পরিশোভিত হ'য়ে, নিরূপিত স্থানে উপবেশন ক'রে, সভাগৃহ আলোকিত ক'রেছেন। সভাটী ঠিক যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। স্বয়ম্বরের শুভক্ষণ সমাগত। অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী রাজনন্দিনী দময়ন্তী বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও বিবিধ কারুকার্য্যময় বেশভূষায়

সুসজ্জিত হ'য়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে সভাগৃহে প্রবেশ ক'র্‌লেন। তাঁ'র হাতে মহামূল্য মণি-মাণিক্যের কাজ করা সোণার থালায় বিচিত্র পুষ্পমাল্য। রাজগণ তাঁ'র ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিখানির দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে গেলেন এবং উৎফুল্ল নয়নে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। সকলেই সেই রমণী-রত্ন লাভের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়্‌লেন।

দময়ন্তী ধীর গজেন্দ্রগমনে একে একে রাজন্যগণের সম্মুখীন হ'চ্ছেন, যাঁ'র কাছেই যান, তাঁ'র হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। আবার ক্ষণপরে তিনি চলে' যা'বামাত্র বিষাদের কালিমা এসে তাঁ'র হৃদয়কে এককালে আবৃত করে ফেলে। এইরূপে প্রায় সকল রাজগণকেই ক্ষণিক উল্লাসের পর চির-মর্ম্মবেদনায় আচ্ছন্ন ক'রে দময়ন্তী সভা-মণ্ডপের শেষ প্রান্তে চ'ল্‌লেন। দময়ন্তী সকল রাজার নিকটেই যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁ'র অন্তরাত্মা তাঁ'র একমাত্র আরাধ্য দেবতা নলরাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাঁ'কে দেখ্‌তে না পেয়ে মনে মনে চিন্তা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, কই কোথায় তিনি—কোথাও ত তাঁ'কে দেখ্‌ছি

না—তবে কি তিনি আসেন নাই—পথে কোন বাধা বিঘ্ন হয় নাই ত! অথবা দেবগণের পরামর্শে তিনি সকল বাসনা ত্যাগ ক'র্‌লেন? এইরূপ চিন্তায় তাঁ'র প্রাণ মুহুর্মুহু আলোড়িত—হৃদয় স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌লো।

একে একে সকল রাজগণকে অতিক্রম ক'রে সভাগৃহের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হ'য়ে, তিনি এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন ক'র্‌লেন—দেখ্‌লেন, পাঁচজন রাজা নলরাজের রূপ ধ'রে ঠিক পাশাপাশি ব'সে আছেন। তাঁদের মধ্যে কে যে আসল নলরাজ, তা' কিছুতেই স্থির কর্‌বার উপায় নেই। বুদ্ধিমতী দময়ন্তী তাঁ'দিগে দেখ্‌বামাত্রই বুঝ্‌তে পার্‌লেন, ইন্দ্র বরুণাদি দেবতারা ছদ্মবেশ ধ'রে, তাঁ'কে পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছেন। তিনি তখনই নতজানু হ'য়ে করযোড়ে কাতরভাবে তাঁদের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌লেন, "হে দেবগণ! আপনারা সকলেই আমার পিতৃ-তুল্য, আমি আপনাদের কন্যা-স্থানীয়া। এই জ্ঞানহীনা কন্যার উপর এরূপ কঠোর বিধান—ছলনা, কেন ক'র্‌ছেন, দয়াময়! আপনাদের স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ

ক'রে, এই ঘোর পরীক্ষার দায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমার হৃদয়-আসনের একমাত্র উপাস্য দেবতা নলরাজকে দেখিয়ে দিয়ে আপনাদের এই অবলা কন্যার জীবন এবং সতীত্ব রক্ষা করুন।"

দেবগণ দময়ন্তীর অকপট পতিভক্তিগুণে মুগ্ধ হ'য়ে, নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'র্লেন এবং তাঁ'কে ভূয়সী ধন্যবাদ দিতে লাগ্লেন। তখন দময়ন্তী তাঁ'র রূপের দেবতা নলরাজকে চিন্তে পার্লেন এবং তাঁ'র গলায় বরমাল্য প্রদান ক'রে অপার আনন্দলাভ ক'র্লেন।

দেবগণ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, দময়ন্তীর পতিভক্তির অশেষ প্রশংসা কর্'তে ক'র্তে দিব্যরথে আরোহণ ক'রে স্বর্গে গমন ক'র্লেন। পথে যাচ্ছেন, এমন সময়ে কলি ও দ্বাপরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। তাঁ'রাও দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনে, তাঁ'র পাণি-প্রার্থী হ'য়ে বিদর্ভ রাজ্যে যাচ্ছিলেন। কলি যখন শুন্লেন যে, দময়ন্তী ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাদিগে বরণ না ক'রে নলরাজের গলায় বরমাল্য দিয়েছেন,—সকলের সাম্নে দেবগণের অপমান ক'রেছেন—তখন তিনি আরক্তলোচন হ'য়ে দময়ন্তীর অহঙ্কারের প্রতিশোধ

নেবার অঙ্গীকার ক'র্লেন। দেবগণ তাঁ'কে সান্ত্বনা ক'র্তে অনেক চেষ্টা ক'র্লেন, কিন্তু কিছুতেই কলির রোষের লাঘব হ'ল না। সেই সময় হ'তে কলি ও দ্বাপর দময়ন্তীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্তে লাগ্লেন।

বিবাহের পরদিন মহারাজ নল দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে মহা আড়ম্বরে নিষদ রাজ্যে উপস্থিত হ'লেন। নিষদ রাজ্যের ঘরে ঘরে মঙ্গলঘট বসান হ'লো—শাঁখ ও হুলুধ্বনির রোল প'ড়ে গেল। কয়েক দিন ধ'রে বিবিধ আনন্দোৎসব ও ধূমধাম ক'রে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়ান দাওয়ান ও দান ধ্যান চ'ল্তে লাগ্লো। ব্রাহ্মণ শ্রমণ, অতিথি অভ্যাগত, দীন দরিদ্র সকলেই ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হ'য়ে, তল্পি তল্পা বোঝাই ক'রে নলদময়ন্তীর যশোগান কীর্ত্তন ক'র্তে ক'র্তে খুসী মনে ফিরে গেল। নলরাজ দময়ন্তীর সহিত পরম সুখে কালযাপন ক'র্তে লাগ্লেন। কিছুদিন পরে তাঁদের একটী পুত্র ও একটী কন্যা হ'লো। ছেলে মেয়ের নাম রাখ্লেন ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা। মা বাপের মত ছেলে মেয়ে দু'টীরও অতুলনীয় রূপ।

পুত্র-কন্যা দু'টীকে পেয়ে তাঁদের আর সুখের সীমা নাই। নল-দময়ন্তীর ঈদৃশ পবিত্র প্রণয় ও এবম্বিধ সুখৈশ্বর্য্য দেখে, কলির অন্তর হিংসায় জ্ব'লে যেতে লাগ্‌লো।

নলরাজের একটী ভাই ছিল, তা'র নাম পুষ্কর। নলরাজ একদিকে যেমন ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান্‌, ভাইটীর চরিত্র কিন্তু তা'র সম্পূর্ণ বিপরীত—সে অত্যন্ত পাপাচারী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ। তফাতে থেকে অনবরতই নলরাজের শত্রুতা ও অনিষ্ট চিন্তা করে। এমন গুণের ভাই পরম ধার্ম্মিক নলরাজের উপর তা'র আগাগোড়া বিষ-দৃষ্টি ছিল। কলি এই ভাইকে দিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধারের মতলব স্থির ক'র্‌লেন এবং একদিন পুষ্করের কাছে গিয়ে ব'ল্‌লেন, "তুমি নলরাজকে পাশা খেলায় আহ্বান কর। আমার সাহায্যে তুমি খেলায় জয়লাভ ক'র্‌বে। খেলায় পরাস্ত ক'রে নলরাজকে রাজ্য থেকে দূর্‌ ক'রে দাও এবং পরম সুখে রাজ্য ভোগ কর।"

দুর্ম্মতি পুষ্কর কলির প্রস্তাব শুনে বড়ই খুসী হ'লো এবং পরদিনই নলরাজকে পাশা খেলায়

আহ্বান ক'র্‌লে। কলির প্রভাবে প্রতিবারেই নলরাজের হা'র হ'তে লাগ্‌লো এবং একে একে রাজ্য ধন দৌলত যা' কিছু ছিল, সকলই খোয়াতে লাগ্‌লেন, পরিশেষে—সপরিবারে নির্ব্বাসিত হ'লেন।

পুত্রকন্যা দু'টীকে তাদের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, নল-দময়ন্তী বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। নলরাজ দময়ন্তীকে তাঁ'র পিতৃভবনে যাবার জন্য কত অনুরোধ ক'র্‌লেন, কতই না বোঝালেন। কিন্তু পতি-পরায়ণা দময়ন্তী কিছুতেই পতিকে ছেড়ে যেতে সম্মত হ'লেন না—স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বনে চ'ল্‌লেন। রাজার মেয়ে ও রাজার মহিষী হ'য়ে নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় ও অসহায় ভাবে বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ান কতই কষ্টদায়ক! কিন্তু এরূপ নিদারুণ দুঃখ যাতনাও পতিব্রতা দময়ন্তীর নিকট অতি তুচ্ছ ব'লে বোধ হ'ল। রাজ-ঐশ্বর্য্য—সুখ-সম্ভোগ-বাসনা এককালে মন থেকে দূরীভূত হ'য়ে গেল। এমন কি, ক্ষণিকের তরেও সে কথা তাঁ'র মনে স্থান পায় নাই। অকাতরে সকল দুঃখ কষ্টই হাসিমুখে সহ্য ক'র্‌তে

লাগ্‌লেন,—একদিনের জন্য তাঁ'র মুখে বিষাদ, ক্লেশ বা কাতরতার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

নলরাজ দময়ন্তীর বনবাসের এইরূপ কষ্ট দেখে কাতর হ'য়ে প'ড়্‌লেন এবং তাঁ'র পিত্রালয়ে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। দময়ন্তী কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে' কোথাও যাবেন না। চির সুখের নিদান, চির শান্তির আধার স্বামীর চরণ ছাড়া হ'য়ে, খাওয়া-পরার সুখকে অতি তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর মনে ক'র্‌তেন। বনবাসে দু'জনেরই অত্যন্ত কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। যে দিন থেকে বনে এসেছেন, একদিনও পেট ভ'রে খেতে পান না! হায়রে! এমনি বিধিলিপি যে, মহারাজ নল ও তাঁ'র মহিষী দময়ন্তী আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত!

একদিন নলরাজ ক্ষুধার যাতনায় এরূপ কাতর হ'য়ে প'ড়্‌লেন যে, বনের মধ্যে একঝাঁক পাখী ব'সে আছে দেখে, সেগুলি ধর্‌বার জন্য একমাত্র পরিধেয় কাপড়খানি পাখীর ঝাঁকের উপরে ফেলে দিলেন—ইচ্ছা, পাখীগুলি ধ'রে সে দিন পেট ভ'রে আহার ক'র্‌বেন। কিন্তু হায়! পাখী ধরা ত দূরে গেল,

পাখীরা সেই কাপড় খানি নিয়ে কোথায় যে উড়ে গেল, দেখা গেল না! নলরাজ উলঙ্গ হ'য়ে লজ্জায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়্লেন। পতিপরায়ণা দময়ন্তী মহারাজের এই রকম অবস্থা দেখে, প্রাণে বড়ই ব্যথা পেলেন এবং দ্রুতপদে স্বামীর কাছে গিয়ে, তাঁ'র কাপড়ের আঁচল স্বামীকে পরিয়ে দিলেন। এখন দময়ন্তী যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন—স্বামী আর তাঁ'কে ছেড়ে যেতে পা'র্বেন না।

এক বস্ত্রের এক খুঁট স্বামী প'রেছেন, আর এক খুঁট স্ত্রী প'রেছেন—এই রকম ভাবে দু'জনে বনের মধ্যে যাচ্ছেন। কিছুদূর যাবার পর দময়ন্তী অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্লেন এবং এক গাছের তলায় নলরাজের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়্লেন। দময়ন্তীকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত দেখে, নলরাজের মাথায় এক খেয়াল চাপ্লো—তিনি রাজমহিষীকে সেখানে রেখে নিজে পালাবার মতলব ক'র্লেন। মনে মনে ভাব্লেন, "মহিষীর এ রকম দুঃখ যাতনা আর ত চোখে দেখা যায় না। অথচ কিছুতেই ত' ইনি আমাকে ছেড়ে যেতে চান না। আমি চ'লে গেলে নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী

পুণ্য-কাহিনী ১৪০ পৃষ্ঠা—

নলরাজ দময়ন্তীকে ফেলিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

যাবেন। আমাকে পালাতেই হ'বে!" এইরূপ স্থির ক'রে তিনি কাপড়খানি মাঝামাঝি দু'খান ক'রে ফেল্লেন এবং দময়ন্তীকে আস্তে আস্তে কোল থেকে নামিয়ে, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন!

কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীর ঘুম ভাঙ্‌লো। উঠে স্বামীকে দেখ্‌তে না পেয়ে প্রথমে একটু চিন্তিত হ'লেন। মনে ক'র্‌লেন, নলরাজ বোধ হয় কোন কাজে বনের মধ্যে গেছেন। তাঁ'র ফের্‌বার আশায় কিছুক্ষণ সেখানেই ব'সে রইলেন। "কিন্তু কই, নলরাজ ত এলেন না, তিনি কোথায় গেলেন, তবে কি সত্য সত্যই তিনি আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন?" এইরূপে চিন্তা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এতক্ষণ কাপড়ের কথা তাঁ'র আদৌ মনে ছিল না। হঠাৎ কাপড়খানির উপর নজর পড়্‌বামাত্র বুঝ্‌তে পার্‌লেন, নলরাজ নিশ্চয়ই অর্দ্ধ বস্ত্র প'রে প্রস্থান ক'রেছেন। তখন তিনি আকুলপ্রাণে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'র সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে, বনের পশু পাখীরাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। বৃক্ষ লতারাও যেন সেই বিলাপধ্বনি শ্রবণ ক'রে নিশ্চল নিস্পন্দ

হ'য়ে, তাঁ'র দুঃখে সমবেদনা জানাতে লাগ্‌লো। তিনি "কোথায় প্রাণনাথ! হৃদয়-সর্ব্বস্ব আমার, কোথায় গেলে প্রভু! প্রভু একবার দেখা দাও। কি পাপে তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণাধার পুরুষ-প্রবরকে হারালাম?"—এইরূপে বিলাপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বনের মধ্যে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বনের চারদিক্ পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজ্‌লেন—কই, কোথাও ত নলরাজ নাই!

পাগলিনীর মত বনের মধ্যে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গাছপালা, জীবজন্তু, পাহাড় পর্ব্বত, নদী সরোবর,—সাম্‌নে যা' কিছু দেখ্‌তে পান, তা'কেই জিজ্ঞাসা করেন, "হে বৃক্ষলতা, হে বনবিহারী পশুপাখী! তোমরা কি নলরাজকে দেখেছ? অয়ি কল্লোলিনি! তুমি ত দেশ দেশান্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'চ্ছ, আমার নলরাজ কি তোমার কূলে জলপান ক'র্‌তে এসেছিলেন? হে অভ্রভেদী ভূ-ধর! তুমি ত সমুন্নত মস্তক উত্তোলন ক'রে বহু দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছো, তুমি কি আমার প্রাণ-পতি নলরাজকে দেখেছো?"

এইরূপ ভাবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, বিলাপ ক'র্‌তে

ক'র্তে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে একদিন একটা অজগর সাপ কুলোর মত ফণা তুলে তাঁ'র দিকে ছুটে এলো! সাপটাকে দেখেই তিনি ভয়ে আঁৎকে উঠ্লেন এবং সেখান থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা ক'র্ছেন, ঠিক্ সেই সময়ে একটা ব্যাধ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে সাপ্টাকে দেখেই তীর ছুঁড়ে মেরে ফেল্লে।

সাপটাকে মেরে দময়ন্তীকে ভয়মুক্ত ক'র্লে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই পাপাশয় ব্যাধ তাঁ'র রূপে এ রকম আকৃষ্ট হ'লো যে, সাপের চেয়েও ভীষণ মূর্ত্তি ধ'রে তাঁ'কে আক্রমণ ক'র্বার চেষ্টা ক'র্লে। বিজন বন—জনপ্রাণী নেই,—কৃতান্তের ন্যায় ব্যাধের করাল কবল থেকে কি ক'রে রক্ষা পাবেন, ভেবে ভয়ে আকুল হ'য়ে প'ড়্লেন এবং সেই অগতির গতি,বিপদ্ তারণ ভগবান্কে সকাতরে ডাক্তে লাগ্লেন। ব্যাধকে পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রে কত কাকুতি মিনতি অনুনয় বিনয় ক'র্-লেন। কিন্তু পাপমতি ব্যাধের হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হ'লো না—তা'র পাপ আকাঙ্ক্ষা হ'তে নিবৃত্ত হ'লো না। তখন দময়ন্তী ফি'রে দাঁড়িয়ে ব্যাধের প্রতি এমন তীব্র

দৃষ্টিতে চাইলেন যে, বোধ হ'লো যেন তাঁ'র চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। সতীর ক্রোধাগ্নিতে ব্যাধের ভীষণ অন্তর্দাহ হ'তে লাগ্‌লো এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

বনে বনে কিছুদিন এই রকম ভাবে ঘুরে বেড়াবার পর, তিনি এক নগরে এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন তিনি ঘোর উন্মাদিনী—পূর্ব্বের কথা কিছুই তাঁ'র স্মরণ নাই। কেবল মহারাজ নলের নামটাই মনে আছে। তাঁ'র সেই আলু থালু বেশ, জট-পড়া এলো মেলো চুল ও ছেঁড়া ময়লা কাপড় দেখে রাস্তার দুষ্টু ছেলেরা তাঁ'র পিছু লাগ্‌লো—কেউ ঢিল ছুঁড়্‌ছে—কেউ গায়ে ধূলো দিচ্ছে—কেউ বা চিম্‌টি কাট্‌ছে, কেউ বা পাগ্‌লী পাগ্‌লী ব'লে ডাক্‌ছে, আর হাততালি দিয়ে রাগাচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে তাড়া করেন, আর ছেলের দল কে কোথায় আছে!—কেউ বা পালাতে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ বা এ ও'র ঘাড়ে, সে তা'র ঘাড়ে প'ড়ে যাচ্ছে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে—গড়াগড়ি যাচ্ছে।

তিনি যে নগরে এলেন, এই নগরের নাম

পুণ্য-কাহিনী ১৪৪ পৃষ্ঠা—

সতীর তেজে দুরাচার ব্যাধ দগ্ধ হইয়া গেল

অভয়া প্রেস, কলিকাতা।

চেদীরাজ্য। যখন তিনি রাজবাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাজমাতা জানালার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেন এবং তাঁ'র ধরণধারাণ, দেহের লাবণ্য দেখে মনে ক'র্‌লেন, মেয়েটী নিশ্চয়ই কোন বড়বংশের মেয়ে হ'বে। তখন তিনি একজন চাক্‌রাণী পাঠিয়ে দময়ন্তীকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং সেখানে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ ক'র্‌লেন। দময়ন্তী ব'ল্‌লেন, "মা, আমি আপনার এই রকম সদয় ব্যবহারে ও আদর যত্নে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু মা, স্বামী আমাকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া অবধি আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, কোন পুরুষের কাছে যাবো না বা কথা কইব না, কারো উচ্ছিষ্ট ছোঁবো না এবং কারো পায়ে হাত দোবো না। আপনার এখানে থাক্‌লে যদি আমার ব্রতভঙ্গ না হয়, তবেই থাক্‌তে পারি।" রাজমাতা তা'তেই সম্মত হ'য়ে তাঁ'কে বাড়ীতে রাখ্‌লেন। বিশেষ যত্ন ক'রে তাঁ'র গা-হাত-পা পরিষ্কার ক'রে দিলেন এবং তাঁ'র কন্যার কাছে একসঙ্গে থাক্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। দময়ন্তী নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত-পা পরিষ্কার ক'র্‌লেন বটে, কিন্তু সেই

ছেঁড়া আধখানা কাপড় প'রে এবং রুক্ষ চুলেই র'ইলেন। রাজমাতা ও রাজকুমারী কেউই তাঁ'কে ভাল কাপড় পরাতে পা'র্‌লেন না।

এই রকম ভাবে কিছু দিন যায়, এমন সময়ে বিদর্ভ রাজ্য থেকে সুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ চেদী রাজ্যে এসে রাজ-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌লেন। ভীমসেন কন্যা-জামাতার কোন খবর না পেয়ে নানা দেশে লোক পাঠিয়েছেন। সুদেবও নলদময়ন্তীর সন্ধানে এসেছেন। রাজমাতার সঙ্গে কথা ক'ইতে ক'ইতে দময়ন্তীর দিকে দৃষ্টি পড়্‌বামাত্র তিনি তাঁ'কে চিন্‌তে পার্‌লেন। একে ত বাল্যকাল থেকেই তাঁ'কে দেখ্‌ছেন, তা' ছাড়া তাঁকে চেন্‌বার আর একটী সহজ উপায় ছিল—তাঁ'র ভুরুতে একটা তিলের দাগ ছিল।

রাজমাতা দময়ন্তীর মাসী। অনেক দিন দেখা শোনা নেই—তাই কেউ কাকেও চিন্‌তে পারেন না। সুদেবের মুখে দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে তিনি বড়ই খুসী হ'লেন এবং আসল কথা লুকিয়ে রাখার জন্য দময়ন্তীকে স্নেহের তিরস্কার ক'র্‌লেন। সেদিন থেকে রাজমাতা

তাঁকে খুব আদর যত্ন ক'র্‌তেন। কিছুদিন পরে রাজ-কন্যার উপযোগী রথ ও লোকজন সঙ্গে দিয়ে তাঁকে বিদর্ভ রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

বহু দিন পরে রাজা ও রাণী তাঁ'দের অতি যত্নের ধন কন্যাকে পেয়ে' আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন। মা ও মেয়ে পরস্পর গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ভেসে যেতে লাগ্‌লেন। তাঁদের এই কান্না দেখে দময়ন্তীর অতি আদরের ছেলে মেয়ে ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দময়ন্তী অঞ্চলের নিধি দু'টীকে কোলে নিয়ে মুখে শত শত চুমো খেলেন, কত আদর যত্ন ও সোহাগ ক'র্‌লেন। অনেক দিন মা বাপকে দেখ্‌তে পায় না—আজ মাকে দেখে' তা'রা যেন হাতে চাঁদ পেলে, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেল।

স্নেহ মমতার আধার পিতা মাতা—বুক জুড়ানো ধন পুত্র কন্যাকে পেয়ে এবং রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য দময়ন্তী প্রাণে শান্তি পেলেন না—প্রাণের যে ব্যাকুলতা, একটুও তা'র হ্রাস হ'লো না। সদা সর্ব্বদাই নলরাজের চিন্তায় নিমগ্ন থাক্‌তেন।

বাপ মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সেই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান ক'রে ও রূক্ষ কেশেই রইলেন।

অল্প কয়েকদিন পরেই বিদর্ভরাজ নলরাজের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠালেন। দময়ন্তী তাঁ'দের সকলকেই ব'লে দিলেন, "আপনারা যেখানে যাবেন, সেখানেই এবং যাঁ'কে দেখ্‌বেন, তাঁ'কেই এই প্রশ্ন ক'র্‌বেন—

'নিদ্রিতা দয়িতা ত্যজি পরি' অর্দ্ধ শাড়ী,
কি দোষে ফেলিয়া যায় সতী স্বাধ্বী নারী ?'

এবং এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া মাত্র অন্য কোন কথা না ব'লে, বিদর্ভ রাজ্যে শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন।"

ব্রাহ্মণগণ বহু ধনরত্ন ও বিবিধ পুরস্কার পাবার আশায় দ্রুতপদে নলরাজের সন্ধানে বেরুলেন। এদেশ, ওদেশ, সেদেশ—কত দূর দূরান্তরে—নূতন নূতন রাজ্যে যাচ্ছেন—আর যেখানেই যান, সেখানেই ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেন। কেউই কোন উত্তর দিতে পারে না। এই ভাবে তাঁ'রা অনেক দিন ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, অবশেষে এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে এই প্রশ্ন

ক'র্‌লেন ; রাজা, মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত বা সভার কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌লেন না। রাজা ঋতুপর্ণের বাহুক নামে এক সারথি ছিল। সারথি ব্রাহ্মণের এই প্রশ্ন শুনেছিল। ব্রাহ্মণ নিরাশ মনে ফিরে যাবার উপক্রম কর্‌ছেন, এমন সময়ে বাহুক তাঁকে তফাতে ডেকে' নিয়ে গিয়ে প্রশ্নের উত্তরে ব'ল্‌লে—

"সাধ্বী সতী পুণ্যবতী নারী যেবা হয়।
কদাচ স্বামীর দোষ দেখিতে না পায়॥
বিত্তহীন বিদ্যাহীন হয় যদি পতি।
সতত অধর্ম্ম আর পাপকাজে মতি॥
তথাপি স্বামীর দোষ নাহি দেখে কভু।
ঢাকিয়া সকল দোষ সেবে সদা প্রভু॥
ত্যজি ভার্য্যা স্বামী যদি দূরেতে পালায়।
পতিব্রতা সতী-মতি পতি পানে ধায়॥"

বাহুকের মুখে এই উত্তর পেয়ে ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে দময়ন্তীর কাছে ফিরে এসে, সকল কথা জানালেন। এই কথা শুনে দময়ন্তী ভাব্‌লেন, "নলরাজ ভিন্ন এরকম উত্তর কেউই দিতে পার্‌বে না।" প্রাণে বড়ই আশা হ'লো। সেই ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'রে বিশ্রাম

ক'র্তে পাঠিয়ে দিলেন এবং অবিলম্বে স্নুদেবকে নিকটে ডেকে ব'ল্লেন, "আপনি এখনই অযোধ্যায় যা'ন এবং সেখানে পৌঁছে ঋতুপর্ণ রাজাকে ব'ল্বেন,—নলরাজ অনেক দিন দেশত্যাগী, তাঁ'র দেশে ফের্বার আশা নেই দেখে, দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হবেন—কল্যই স্বয়ম্বরের দিন—অনেক দিন থেকেই রাজরাজড়ারা বিদর্ভে আস্ছেন, আপনি যদি দময়ন্তী লাভে ইচ্ছা করেন, আজই রওনা হ'ন—আমি তাড়াতাড়ি আপনাকে খবর দিতে এসেছি। তবে কাল প্রভাতেই আপনাকে পৌঁছাতে হ'বে—এমন একজন স্নুদক্ষ রথচালক নিযুক্ত করুন, যে আজ রাত্রের মধ্যেই বিদর্ভরাজ্যে রথ পৌঁছে দিতে পারে।"

স্নুদেব দময়ন্তীর আদেশ পেয়েই রওনা হ'লেন এবং শীঘ্রই অযোধ্যায় পৌঁছিলেন। তিনি রাজসভায় প্রবেশ ক'রে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট দময়ন্তীর উপদেশ মত সকল কথা জ্ঞাপন ক'র্লেন। ঋতুপর্ণ এই কথা শুনে, দময়ন্তীকে পাবার আশায় বড়ই চঞ্চল হ'য়ে প'ড়্লেন এবং সারথিকে ডেকে ব'ল্লেন, "আমি আজ রাত্রি শেষের পূর্ব্বেই বিদর্ভ রাজ্যে যেতে

ইচ্ছা করি। তুমি রথ চালনা ক'রে যথা সময়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে ত ?" বাহুক ব'ল্‌লে, "মহারাজ আপনি সেজন্য ভাব্‌বেন না, আমি তা'র অনেক আগেই রথ বিদর্ভে পৌঁছে দোবো।" রাজাকে প্রস্তুত হ'বার জন্য ব'লে, বাহুক রথ তৈরী ক'র্‌তে চ'লে গেল।

সারথি-রূপী নলরাজ রথ প্রস্তুত ক'র্‌তে গেলেন বটে, কিন্তু দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুনে, অতিমাত্র বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁ'র হৃদয়কে অন্ধকারময় ক'রে তুল্‌লে। ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "দময়ন্তী দ্বিতীয় পতি গ্রহণ ক'র্‌বেন, একি সত্য ? যে দময়ন্তী ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতাদিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে নলরাজকে বরণ ক'রেছেন, যিনি স্বামীকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও থাক্‌তে পার্‌তেন না, তিনি আবার স্বয়ম্বরা হবেন—অন্য পতি গ্রহণ ক'র্‌বেন, এও কি সম্ভব ? নারী-চরিত্র কি এতই দুর্ভেদ্য, নারী জাতি কি এতই নীচাশয়া, এতই আত্ম-সুখ-প্রয়াসী, রমণী-হৃদয় কি এতই তরল ? অথবা নলরাজকে পাবার জন্য দময়ন্তীর এই কৌশল !" এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি প্রাণে বড়ই অশান্তি ভোগ

ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—বিদর্ভে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখ্‌বার জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়্‌লেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে রথ প্রস্তুত ক'রে রাজার নিকট উপস্থিত হ'লেন।

ঋতুপর্ণ রাজা রথে আরোহণ কর্‌বামাত্র বাহুক বায়ুবেগে রথ চালনা ক'র্‌লেন। ঋতুপর্ণ জীবনে কখনও এমন রথ-চালনা দেখেন নাই। তিনি বাহুকের এই অদ্ভুত শিক্ষা দেখে চমৎকৃত হ'লেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁ'কে এক অদ্ভুত গণনা বিদ্যা শেখালেন। বাহুকও প্রতিদান স্বরূপ তাঁ'কে রথ চালনা বিদ্যা শেখালেন।

এতদিন কলি নলরাজের দেহে প্রবেশ ক'রে, নানারকমে তাঁ'র নির্য্যাতন ক'র্‌ছিলেন। গণনা বিদ্যার শক্তি-প্রভাবে কলি যাতনায় অস্থির হ'য়ে, নলরাজের শরীর থেকে বেরিয়ে এলেন। নলরাজ কলিকে সম্মুখে দেখ্‌বামাত্র তাঁ'কে বধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লেন। তখন কলি হাত যোড় ক'রে অতি কাতরভাবে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌লেন এবং ব'ল্‌লেন, 'পুণ্যশ্লোক নলরাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন। দময়ন্তী দেবগণের অপমান ক'রে

আপনাকে বরমাল্য দিয়েছিলেন, তাই তাঁকে শাস্তি দোবো ব'লে আমি আপনাকে অনেক দুঃখ যাতনা দিয়েছি। গণনা বিদ্যার তেজে আমি আর আপনার শরীরে থাক্‌তে পার্‌লাম না। আপনি শীঘ্রই রাজ্য, রাজমহিষী, পুত্র কন্যা সকলই ফিরে পাবেন। আমাকে বধ ক'র্‌বেন না--ক্ষমা করুন—প্রাণ ভিক্ষা দিন।"
নলরাজ কলির কাতর প্রার্থনায় তাঁকে ক্ষমা ক'র্‌লেন এবং দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হ'লেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই দময়ন্তী প্রাসাদের ছাদে উঠে, একদৃষ্টে অযোধ্যার পথের দিকে অনিমিষ-নয়নে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জান্‌তেন, এই সারথি যদি প্রকৃত নলরাজ হন, তবে নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঋতুপর্ণ রাজার রথ বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হবে। সন্ধ্যা হ'তে আর একটু বাকি আছে, এমন সময়ে দূর থেকে মেঘের গর্জ্জনের মত গুড়্ গুড়্ শব্দ শোনা গেল। এই শব্দ শুনে, দময়ন্তীর বুক দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো—ঘন ঘন নিশ্বাস প'ড়্‌তে লাগ্‌লো—আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। ভয় ও

ভরসা, আশা ও আশঙ্কা, হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ তাঁ'র হৃদয়কে আলোড়িত ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

অল্পক্ষণ পরেই রথ সিংহদ্বারে এসে হাজির হ'লো। দময়ন্তী প্রাণে বড় আশা পোষণ ক'রে রথের আগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌ছিলেন। কিন্তু সারথির চেহারা দেখে তাঁ'র সকল আশা ভরসা একেবারেই লীন হ'য়ে গেল! ভাব্‌লেন, যাঁ'র মত কান্তিময় পুরুষ নরলোকে আর নাই, এই কদাকার সারথি কি সেই নলরাজ হ'তে পারে? সত্য মিথ্যা নিশ্চয় জান্‌বার জন্য দময়ন্তী কেশিনী নামে একজন বুদ্ধিমতী দাসীকে সারথির কাছে পাঠালেন—তা'র কার্য্য-কলাপ দেখ্‌বার জন্য।

ঋতুপর্ণ রাজা প্রাণে অনেক আশা নিয়ে বিদর্ভে এসেছিলেন। কিন্তু রাজসভার মধ্যে প্রবেশ ক'রে যা' দেখ্‌লেন, তা'তে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন—স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন, জাঁক-জমক— কোন চিহ্নই নাই! বিদর্ভরাজ অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণকে দেখে, সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমুচিত আদর অভ্যর্থনা ক'রে তাঁ'কে গ্রহণ ক'র্‌লেন।

সারথি পাকশাক ক'চ্ছে, এমন সময় কেশিনী

তা'র কাছে গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে লাগ্‌লো। যা' দেখ্‌লে, তা'তে অবাক্ হ'য়ে গেল! শূন্য কলসী কাত্ হ'য়ে প'ড়ে আছে—সারথি যেমনি জল গড়াতে গেল, অমনি কলসী জলে ভ'রে গেল। উনুনে আগুন নেই—দু'চার খানা কাঠ উনুনে দিয়ে যেমনি ফুঁ দিলে, অমনি দাউ দাউ ক'রে কাঠ জ্বলে উঠ্‌লো! কেশিনী এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল! কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "তুমি কে, কি জন্য এখানে এসেছো?" সারথি ব'ল্‌লে, "আমি ঋতুপর্ণ রাজার সারথি। তোমাদের রাজকুমারীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুনে রাজাকে নিয়ে এসেছি।" কেশিনী এই কথা শুনে চ'টেই আগুন। "কি, এত বড় অন্যায় কথা তুমি মুখে আন? যে রাজনন্দিনী পতি-বিরহে অর্দ্ধ বস্ত্র প'রে স্বামীর নাম জপমালা ক'রে রেখেছেন, সন্ন্যাসিনীর মত যিনি অতি দীন ভাবে দিনযাপন ক'র্‌ছেন, তাঁ'র নামে এরূপ কলঙ্কের কথা? সাবধান, দ্বিতীয়বার এরূপ কথা আর মুখে আন্‌বে না।" সারথি দাসীর মুখে এই কথা শুনে অপ্রতিভ হ'য়ে

গেল—দময়ন্তীর পতিভক্তির কথা চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তা'র চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌লো।

কেশিনী দময়ন্তীর কাছে সারথির আশ্চর্য্য কার্য্য-কলাপের কথা আগাগোড়া বর্ণন ক'র্‌লে। দময়ন্তী এই সকল কথা শুনে অপার আনন্দ লাভ ক'র্‌লেন। তাঁ'র চোখ দিয়ে দর-বিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু ঝ'র্‌তে লাগ্‌লো। স্থির বুঝ্‌লেন, এই সারথি নলরাজ ভিন্ন আর কেউ নন। তখন মায়ের কাছে সকল কথা জানালেন এবং তাঁ'র আদেশ অনুযায়ী ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সারথি-বেশধারী নলরাজের কাছে উপস্থিত হ'লেন।

দময়ন্তী সম্মুখে উপস্থিত হ'বামাত্র নলরাজ চিন্‌তে পার্‌লেন। কিন্তু মুখে কিছু ব্যক্ত ক'র্‌তে পার্‌লেন না। পুত্র-কন্যাকে কোলে নিয়ে শত শত চুমো খেলেন এবং চোখের জলে ভেসে যেতে লাগ্‌লেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই কেবল কাঁদ্‌ছেন, আবেগ ভরে কারো মুখে একটী কথাও স'র্‌লো না। বহুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে নলরাজ ব'ল্‌লেন, "যে বিদর্ভরাজ-দুহিতা দেবতাগণকে উপেক্ষা ক'রে নলরাজকে বরণ

ক'রেছিলেন, আজ সেই দময়ন্তীরই দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুন্‌তে হ'লো! এর চেয়ে দুঃখের বিষয়—মর্ম্মান্তিক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে?"

দময়ন্তী শুনে লজ্জিতা হ'লেন এবং অভিমান ভরে ব'ল্‌লেন, "যে দময়ন্তী এককালে নিষদরাজ নলরাজের গলায় মালা দিয়েছিল, সেই দময়ন্তীই আজ যখন সারথি-বেশী নলরাজকে পতি ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ছে—তখন দ্বিতীয় পতি-গ্রহণ না হ'লেও, দ্বিতীয় বার স্বয়ম্বর ত ব'ল্‌তেই হবে।"

নলরাজ এই কথা শুনে বড়ই লজ্জিত হ'লেন। তারপর যে কারণে তিনি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তাঁকে ছেড়ে যাবার পর যে যে ঘটনা ঘ'টেছিল, একে একে সব কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। কর্কটের দংশনে কিরূপে তাঁ'র দেহ কালো হ'য়ে গেছে, তাও ব'ল্‌লেন। দময়ন্তীর অনুরোধে তিনি কর্কটকে স্মরণ ক'র্‌লেন এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-রূপ ফিরে পেলেন। দু'জনেই নিজের নিজের দুঃখের কাহিনী ব'ল্‌তে বল্‌তে সারারাত কোথায় দিয়ে, কি ক'রে কেটে গেল, কেউই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। বাস্তবিকই দময়ন্তীর যেন

দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হ'য়ে গেল। এত দিনের বিচ্ছেদ, এই যে দারুণ বিরহ যাতনা, এত যে দুঃখ কষ্ট, নিমেষ মধ্যে সব ভুলে গেলেন এবং অপার আনন্দে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লেন।

পরদিন প্রভাতেই এই শুভ সংবাদ রাজ্যের চারদিকে প্রচারিত হ'লো। ঋতুপর্ণ রাজা তাঁ'র সারথি বাহুকের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে বড় খুসী হ'লেন এবং নলরাজের প্রতি অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তাঁ'র কাছে মাপ চাইলেন—আলিঙ্গন ক'রে পরস্পর সখ্যতা স্থাপন ক'র্‌লেন। ঋতুপর্ণ কয়েক দিন বিদর্ভ রাজ্যে অবস্থিতি ক'রে এই আনন্দোৎসবে যোগ দিলেন।

বহুদিন পরে কন্যা ও জামাতাকে পেয়ে বিদর্ভরাজ ও রাজমহিষীর আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না। কয়েক দিন পরে বিদর্ভরাজ নলরাজের হাতে বিদর্ভের রাজ্যভার অর্পণ ক'র্‌লেন। রাজ্যে বিপুল আনন্দোৎসবের আয়োজন হ'লো। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত ক'রে মহারাজ নল নিষদ রাজ্যে গেলেন। পুষ্করের সঙ্গে আবার পাশা খেলার আয়োজন হ'লো। তা'কে খেলায় হারিয়ে দিয়ে নলরাজ সিংহাসন লাভ

ক'র্‌লেন এবং পুষ্করকে ক্ষমা ক'রে, তা'কে অভয় দিলেন।

তারপর বৃদ্ধ মন্ত্রী বিদর্ভরাজ্যে গিয়ে, আদর্শ সতী নিষদ-রাজ্য-শ্রী দময়ন্তীকে এবং যুবরাজ ইন্দ্রসেন ও রাজকুমারী ইন্দ্রসেনাকে মহাসমারোহে নিষদ রাজ্যে নিয়ে এলেন। রাজ্যের দ্বারে দ্বারে মাঙ্গলিক ঘট, ফুলের মালা ও জয়-পতাকা শোভা পেতে লাগ্‌লো। পুরবাসিনীগণ হুলুধ্বনি দিয়ে ও শঙ্খধ্বনি ক'রে রাজ-ধানীকে মাতিয়ে তুল্‌লে এবং আদর ক'রে ভক্তি ভরে তাদের রাজ্য-লক্ষ্মীকে বরণ ক'রে তুলে নিলে। নিষদ রাজ্য বহুদিন পরে আবার স্বর্গীয় আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লো—সকলেই পুণ্যশ্লোক নলরাজের ও স্বাধ্বী সতী দময়ন্তীর গুণগানে ও জয় ধ্বনিতে রাজধানী মুখরিত ক'রে তুল্‌লে।

কত যুগযুগান্তর কেটে গেছে। পুণ্যবতী রাজ-মহিষী দময়ন্তী অশেষ দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে সতীত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, পৃথিবীতে পতিভক্তিরূপ যে পুণ্যের আলো ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন্, তা'র তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে,

অন্য কোন জাতিতে কোন কালে পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের কুল-ললনাগণ যেন সেই আদর্শ রমণী-প্রদর্শিত জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের পুণ্য-মার্গের অনুসরণ ক'রে পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতভূমির গৌরব চির অক্ষুন্ন রাখ্‌তে সমর্থ হন।